অপি রায়ের গপ্পো

সৈয়দ মুজতবা আলী

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
১২ সি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে
শিলাদিত্য সিংহরায় কর্তৃক প্রকাশিত
বর্ণ গ্রন্থন: অন্নপূর্ণা কমার্শিয়াল কলেজ,
১৪/১/১, ধর্মদাস কুণ্ডু লেন, শিবপুর হাওড়া-২
ইম্প্রেশন হাউস-এর পক্ষে
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে
রবি দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত

প্রকাশ কাল—শ্রাবণ ১৩৬৭

সূচীপত্র

একি অপূর্ব প্রেম

জন্মভূমির টানে দেশে গিয়েছিলাম।

সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে দেশছাড়া। গ্রামছাড়া।

ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করব, বড় করব এই চিন্তা করেই বাবা দেশের বিশাল জায়গা জমি, ঘরবাড়ী সব অল্পদামে বিক্রী করে চলে আসেন শহরে।

তারপর আর কি। দেখতে দেখতে যুদ্ধ থেমেছে, ভারত স্বাধীন হয়েছে। বছরগুলো ঝরা পাতার মত খসে খসে পড়েছে।

আমি শহরে থেকে বড় হয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি। কলকাতার বড় সরকারী অফিসে চাকরী করেছি। আর এখন রিটায়ার করার পর কেবল ঘুরে বেড়ানোর কাজ নিয়েছি।

ভবঘুরে জীবন।

কেবল প্রকৃতির কোলে বসে নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে বেড়ান। উপভোগ করা শ্যামলী মায়ের অবদান, আর ক্যামেরা বন্দী করে রাখা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য।

নিজের খামখেয়ালির এই ঝক্কি বাড়ীর কাউকে পোয়াতে হয় না। মাসকাবারি পেনশনেব টাকাটা সবটাই তুলে দিই বাড়ীর হাতে। ফলে বাড়ীর সবাই খুশী। আর আমি হাত খরচের জন্য, এই ঘুরে বেড়ানোর জন্য সামান্য কিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কখনও রাজস্থানের উদয়পুরে, কখনও মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহ, কখনও সিমলা, কখনও জম্মু কাশ্মীর বা হরিদ্বার হৃষিকেশ ইত্যাদি।

তা রিটায়ারের পর বারোটা বছরে কত না দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ালাম। কত ছবি তুললাম। কত নির্ঝরিনীর ঝরে যাওয়া জলের ছবি, পাহাড় পর্বতে সূর্য্য ওঠার বা সূর্য্য ডোবার দৃশ্য। মন্দির বা দেবস্থানের পুরোনো সেই সব টেরাকোটার ছবি তুললাম। কিন্তু তবু যেন মন আর ভরে না। রাতে ঘুম হয় না। কেবলই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ট্রেনে চেপে কোথায় যেন চলে যাই। কোথায় নামি জানি না। কোন কোন দিন কলকাতা বা

দিল্লীর ফাইন আর্টস একাডেমীতে নিজের তোলা ছবি খুঁজে বেড়াই।

দিল্লী থেকে ফিরতি পথে সত্যি একদিন একটা নির্জন ছোট্ট স্টেশনে নেমে পড়লাম। কর্ড লাইনের পোড়াবাজার।

তারপর আর কি। লেভেল ক্রসিংয়ের ওধারে গিয়ে বাঁয়ের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে থাকলাম গ্রামের দিকে।

সামনেই একটা ছোট্ট কাঠের পুল। সাঁকো।

কাঠের পুলটা পেরিয়ে সামনে সরু রাস্তা। ধানক্ষেত।

ধানক্ষেতের আল ধরে এগোলে মেঠো বড় রাস্তা। এবার হাঁটতে থাকি উত্তরমুখ করে।

ওই ত দূরে মাঠ পেরিয়ে শ্যামল বনানী ঘিরে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে — যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

পথ চলতে চলতে দেখি কোন চাষী এই সাত সকালে কেমন করে ডোঙ্গায় পা দিয়ে জল ছেঁচছে। আলু ক্ষেতে জল দিচ্ছে। কোথাওবা কোনো চাষী মাঠে লাঙ্গল দিচ্ছে আর গরুর পিঠে ছড়ি মারছে আর মুখে আউরিয়ে যাচ্ছে হ্যাট্ হ্যাট্ হ্যাট্।

ও দিককার ওই গ্রামটার নাম যেন কি — হ্যাঁ ধেমুয়া। লোকে ধেমো বলেই ডাকে। একটু এগোলেই একটা উঁচুমত ঢিবি রাস্তার ধারে। ঢিবিটার ওপর ক'টা লোক উনুনে খেজুর পাতা পুরে দিয়ে বড় বড় হাঁড়িতে জাল দিচ্ছে। হ্যাঁ, খেজুর রস জাল দিয়ে ওরা গুড় তৈরী করছে। — ঝোলা গুড়, পাটালি গুড়।

ছোটবেলায় গ্রামে থাকতে কতবারই না ওই ঢিবিতে উঠে - ওদের গুড় তৈরী করা দেখেছি। তখন ওদের উনুনের পাশে আমরা ২/৫ জন যারাই বসে থাকতাম তাদের হাতে ওরা ওই গরম গুড় ধরিয়ে চাখতে বলত। কি রে ধোঁ গন্ধ হয়নি তো ?

আমরা গুড় চেখে বলতাম না চাচা, ধোঁ গন্ধ হয়নি। খুব ভাল টেস্ট হয়েছে।

রহিম চাচার মুখটা জ্বল জ্বল করে উঠত। যাক্ এত পরিশ্রম তাহলে সার্থক। এবার তবে কলসীতে ভরে ফেলা যাক। এসব

স্মৃতি কথা আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে।

ঢিবিটায় উঠতে ইচ্ছা করছিল।

কিন্তু ওখানে গেলে এই ৫০ সাল বাদে ওদের কেউ কি আমাকে চিনতে পারবে! হয়ত সে রহিম চাচাই নেই, মরে গেছে। যাকগে আর খানিকটা হাঁটলেই নিজের গ্রামে পৌঁছে যাব। ওই ত দূরে দেখা যাচ্ছে সেই ছায়া সুনিবিড় তাল, সুপুরি, আম গাছে ঘেরা সেই আমার গ্রাম, আমার জন্মভূমি মাকালপুর। টিনের ছাউনী দেওয়া ঘরটা এখান থেকে ভালই দেখা যাচ্ছে।

বাবা শঙ্কর প্রসাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, স্বাধীনতার ২/৫ বছর আগে দেশের সব বাড়ী জমি গোবর্দ্ধন রায়কে বিক্রী কোবলা করে দিয়ে শহরে চলে আসেন। আমার তখন কতই বা বয়স দশ বার বছর হবে।

বাবা মায়ের মুখেই শুনেছি দেশের বাড়ী ঘর বিক্রী করলেও মা কালীর মন্দির আর মা মনসার ঢিবিটা বিক্রী করেননি। সেই স্মৃতি ঘেরা রাস্তা দিয়েই হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে এলাম কতটা পথ।

দু পাশে ধানের জমি। সবুজ হলদে গাছে সোনালী ধানের শীষ ধরেছে। হাওয়ায় দুলছে শীষগুলো। আগে এই সব মাঠে একবারই ধান চাষ হোত। কেবল মাত্র বর্ষার জলে। আর এখন পাম্পের দৌলতে জল তুলে সেচ লাগিয়ে বছরে ধান তুলছে তিনবার। তবু ধান চালের আকাল আর গেল না। বাজারে আলুর দাম দশ, চাল দশ, বার, পনের টাকা কেজি।

গরীব চাষীদের যে দুরবস্থা আগেও ছিল এখনও তাই রয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম বারাসাতের মাঠে।

ছোট্ট বেলায় এখানেই সবাই মিলে ফুটবল খেলতাম, ঘুড়ি ওড়াতাম, হাডু-ডু প্রতিযোগিতায় নাম দিতাম।

বাঁ পাশে নতুন পুকুর।

পুকুরের পাড়টা বড় উঁচু। পাড়ে তখনও যেমন কুল, বাবলা, বেল গাছ, রাম তুলসী, আশ শ্যাওড়া ভেরান্ডা গাছে ভর্ত্তি থাকত আজও তেমনি আছে।

ছোটবেলায় নতুন পুকুরের পাড়ে উঠতে বেশ মজা লাগত। যেন পাহাড়ে উঠছি। তখন নতুন পুকুরের পাড়ে একটা বিশাল কদবেলের গাছ ছিল। এখন আর নেই।

এক সাধুবাবার মাথায় ছিল বিরাট জটা জুটো। হিমালয়ে সিদ্ধিলাভ করে এই কদবেল তলায় এসে নিশ্চিন্তে আস্তানা গেড়ে ছিলেন। পরে উঠে যান ত্রিবেণীতে। সেখানে কালীনাথ আশ্রম স্থাপন করেন।

সাধুবাবা এখানে এসে মাটিতে একটা চৌকো গর্ত্ত করে যজ্ঞ করতে শুরু করেন। হোম যজ্ঞ শেষ হলে পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে একবারই অন্ন গ্রহণ করতেন। অন্ন গ্রহণের পূর্বে সাধুবাবা একটা খাম্বাজি হাঁক ছেড়ে ডাকতেন — আয় আয় শিবা আয়। আয় শিবা আয় আয়। তারপর কোথা থেকে দলে দলে সব শেয়ালেরা বন থেকে বেরিয়ে একটা সাড়া দিত — হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া। পরে সবাই এসে সাধুবাবার যজ্ঞবেদী ঘিরে জড় হয়ে দাঁড়াত।

গ্রামের জমিদারবাবু সাধুবাবার অলৌকিক ক্রিয়া কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে সাধুবাবার জন্য একটা পাকা যজ্ঞবেদী বানিয়ে দেন। সেই যজ্ঞবেদীটা এখনও রয়েছে।

শিয়ালেরা এসে দাঁড়ালে পর সাধুবাবা গাওয়া ঘিয়ে তৈরী করা লুচি আর হালুয়া দিয়ে শিবাদের সেবা করতেন। পরে ওরা চলে গেলে সাধুবাবা স্বপাকে রান্না করে অন্নগ্রহণ করতেন।

উঁকি দিয়ে দেখতে ইচ্ছা করল বেদীটা। কিন্তু যা জঙ্গল ঢুকতেই ভয় করতে লাগল। যজ্ঞবেদীর চারপাশে বাবলা আর রামতুলসীর বন, ঝোপঝাড়।

নতুন পুকুরের সেই নিথর সবুজ জলটা দেখা যাচ্ছে ওপর থেকে। আজও তেমনি চক চক করছে। যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিরে কেমন আছিস। বড় রোদ্দুর উঠছে। আয় আমার জলে ডুব দিয়ে স্নান করে একটু শীতল হয়ে যা।

পাড়ের ওদিকটা দিয়ে নেমে জলের কিনারায় পৌছালাম। জুতো খুলে পুকুরের জলে নেমে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। আঃ কি ঠাণ্ডা জল!

পায়ের নীচে সাদা, হলুদ বালি। একটুকুও কাদা নেই। পুকুরের এদিক ওদিকে শ্যাপলা শালুক পদ্মে ভর্ত্তি। আর আছে কলমী লতা। তাতে নীল রঙের ফুল ফুটেছে।

পাড়ের উত্তর-পূর্ব কোণে দেখা যাচ্ছে একটা টালির ঘর। আগে তো এটা ছিল না। কেউ বা হয়তো জবর দখল করে কুঁড়ে বানিয়েছে।

মাঝ পুকুরে একটা বড় রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে।

একটা মেয়েকে দেখা গেল। সাদা থান পরা। মেয়েটা ডাকছে আয় আয় চই চই। দেখলাম মেয়েটার ডাকে সাড়া দিয়ে প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করতে করতে মাঝ পুকুর থেকে ডাঙায় উঠে গেল রাজহাঁসটা।

হাতে বায়নাকুলার। সেটাকে চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগলাম। রাজহাঁসটা জল থেকে উঠতেই মেয়েটা ওর গলায় মাথায় হাত বুলিয়ে কত না আদর করল। নিজের শাড়ীর আঁচল দিয়ে হাঁসের পিঠ ও পেটটা মুছিয়ে দিল। হাঁসটা গলা লম্বা করে মেয়েটার মুখে মুখ দিয়ে আদর করতে লাগল। মেয়েটার হাতে একটা থালা। থালায় করে হাঁসটার জন্য কি যেন নিয়ে এসেছিল। হাঁসটা তার হলুদ ঠোঁট দিয়ে মহানন্দে সেগুলো সব খেয়ে নিল। খাওয়া শেষ হতে মেয়েটা হাঁসটাকে কোলে করে টালির ঘরে ঢুকে গেল।

দৃশ্যটা অপূর্ব লাগল। যাতে ভুলতে না পারি তার জন্য টেলিলেন্স দিয়ে সবটাই ক্যামেরায় বন্দী করলাম।

এবার পাড় থেকে নেমে ওদিককার রাস্তা ধরে গ্রামের সেই বিক্রী করে দেওয়া বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

ওইতো দেখা যাচ্ছে সেই পটুল গাছটা।

একটা মিষ্টি আমের গাছ। মা নাম দিয়েছিল পটুল। ছোট্ট ছোট্ট হলুদ রঙের পেয়ারাফুলির মত আম অসংখ্য ঝুলত আমের সময়। এখনও হয় কি না জানি না। কি মিষ্টি সেই আম!

কিন্তু ওদিককার সেই আম বাগানটা তো দেখছি না।

বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। হায় ভগবান একি জন্মভূমি দেখতে এলাম! শৈশবের স্মৃতি ঘেরা সে সব ঘরবাড়ী আমবাগান এ সব কই।

আমবাগানের বদলে ওখানে হাল চালাচ্ছে ক'জন চাষী। মনে পড়ে শৈশবের কত স্মৃতি। ছোট্টবেলায় ঝড় উঠলেই ওই আমবাগানে ছুটতাম আম কুড়াতে। টিপ ঢাপ করে পাকা আম পড়ত এ গাছ ও গাছ থেকে। গ্রামের কত ছেলে মেয়েই না এসে কোঁচড় ভর্ত্তি করে আম কুড়োত, বাড়ী নিয়ে যেত। তখন কেউ বারণ করত না।

তারপর গ্রামে তো এলাম।

কিন্তু কে আর আমায় চিনবে। আর আমিই বা কাকে খুঁজে পাব যার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলব।

পটুলের আম তলাতেই ছিল মা মনসার ঢিবি। ঢিবিটা আজও আছে। একটা বিশাল মনসাগাছ হয়ে রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সেই প্রাচীনতম গাছের বংশধরের একটা এই ঢিবিতে আজও বিদ্যমান।

একটু দাঁড়িয়ে মা মনসাকে স্মরণ করে প্রণাম করলাম।

এবার সামনের আলুক্ষেতটা পেরোলেই টিনের সেই ঘরটা। যেটা দূরে রেললাইন থেকে নজরে আসছিল। ওটাই আমাদের পৈতৃক বসত বাটি। এত বছর পরেও ও ঘরটার কোন পরিবর্তন হয়নি কেন কে জানে।

ওপাশে দাঁড়িয়ে মা কালীর মন্দির।

শিব কালী একই ঘরে প্রতিষ্ঠিত। কি জানি এখনও পূজো হয় কি না। মন্দিরের মাথার চূড়োতে গজিয়ে উঠেছে বিশাল বটবৃক্ষ। গাছের শেকড় বাকড় দিয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে মন্দিরটাকে জাপটে ধরে আছে।

মন্দিরে একটা দরজার পাল্লা নেই।

দেখলাম মায়ের মূর্ত্তিটা, আর পাশে শিবলিঙ্গ এখনও বিরাজিত। দু'চারটে জবা ফুলও চড়ান রয়েছে মায়ের পায়ে।

মাকে স্মরণ করে প্রণাম করে উঠতেই দেখি এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা বলছেন কে বাবা তুমি। তোমাকে তো চিনলাম না।

বললাম আমার নাম অজিত। ডাক নাম রেণু। বাবা মার কাছে শুনেছি এটাই নাকি আমার জন্মস্থান। কতদিন আগে বাবা এ সব বিক্রীবাটা করে চলে যান। তা জন্মভূমি দেখার সময় পাইনি এতদিন।

তাই একবার দেখতে এলাম। তা মা আপনি?

ও মা! তুমিই রেণু। এস বাবা এস। ঘরে এস। আমি তোমার বড় জেঠিমা হই। বড় কর্তা ছোট কর্তা দুজনেই গত হয়েছে। পড়ে আছি আমরা দুই বুড়ী আর নাতি নাতনীরা। এসো বসো।

প্রণাম করলাম জেঠিমাকে। বুঝলাম ইনিই গোবর্দ্ধন জেঠাব স্ত্রী। এনাদের হাতেই বাবা সব তুলে দিয়ে গেছেন শুধু ঠাকুর থান দুটি ছাড়া।

বাড়িতে বসে জলযোগ করতে করতে দেখলাম ছোটবেলার দেখা সেই সব ঘর বাড়ীর কোনটার চিহ্ন নেই। কোথায় সেই বিশাল উঠোন। কোথায় সেই কলতলা, টিউবওয়েল। সেই খড়ের চালের বড় ঘর। কোথায়ই বা সেই সব মরাই, ঢেঁকিশাল, পায়রা ঘর। উঠোনের সেই বিরাট ক্রোটনগাছটাও আর নেই। এ সবের বদলে ছোট্ট এক চিলতে উঠোনের এপাশে ওপাশে খুপরি খুপরি ঘর বাড়ী, রান্নাঘর বাথরুম।

বড় জেঠিমা, ছোট জেঠিমা দুজনেই এসে বলল তা এ বেলা খেয়ে যাচ্ছ তো? দুটি শাক ভাত খেয়ে যাও। এসেছ যখন দুদিন থেকে গেলেও কোন অসুবিধা হবে না।

জেঠিমাদের প্রথম অনুরোধে জলযোগটা সারলাম। আর বললাম না জেঠিমা থাকা, খাওয়ার জন্য চিন্তা করবেন না। এই তো বেশ, মিষ্টি খেলাম। এবার উঠব। গ্রামটা একটু ঘুরে দেখব। কেউ আমাকে চিনতে পারে কিনা। পরে একদিন ফের আসব। আচ্ছা জেঠিমা বাবার মুখে শুনেছি যোগিন কাকা বলে একজন আমাদের সব জমিজমা দেখা শোনা করত। তার দেখা পাব কোথায় বলতে পারেন?

ও তুমি যোগিনের কথা বলছ। হ্যাঁ ও তো এখনও বেঁচেই আছে। তবে খুবই বুড়ো হয়ে গেছে। ওরা দুই বাপ বেটিতে এখন নতুন পুকুরের ওই পাড়ে একটা ঘর বেঁধে বাস করছে। তা যাও না, গেলেই দেখা পাবে যোগিনের।

তোমার বাবার ডান হাত ছিল ওই যোগিন। ক্ষেত খামার চাষবাস একাই সামলাত বয়েসকালে। এখন আর কিছুই পারে না। তারপর ওর মেয়েটা বিধবা হবার পর আরও ভেঙে পড়েছে। একটা ছেলে থাকলে

বরং বাপকে দেখত।

ঠিক আছে আজ আসি জেঠিমা। দেখি যোগিন কাকার সঙ্গে দেখা হয় কিনা।

দুঃখ বেদনা আর হতাশা নিয়ে জন্মভূমি দেখার সখ মিটিয়ে গেলাম আবার নতুন পুকুরের পাড়ে।

পুকুরের স্বচ্ছ জলে যোগিন কাকার টালির ঘরের ছা'য়া পড়েছে। জল তরঙ্গে কুঁড়ে ঘরের ছায়া তরঙ্গায়িত হচ্ছে। আর দুলছে আমার মন। আবার কি দেখব শুভ্র বসনা থান পরা সেই যুবতী কন্যাকে। আর সেই লম্বা গ্রীবাধারী রাজহংসটাকে।

ডাকলাম দূর থেকে।

যোগিন কাকা বাড়ী আছো? যোগিন কাকা।

— কে? কে ডাকে বাইরে। দেখত মা শ্যামলী। শ্যামলী এল। শ্যামলীর কোলে সেই বড় রাজহাঁসটা। বলল কাকে চান?.

বললাম যোগিন কাকাকে। বলো শঙ্কর বাবুর ছেলে রেণু এসেছে উত্তরপাড়া থেকে। তোমায় ডাকছে।

আর কিছু বলতে হলো না।

দড়ির একটা খাটিয়ায় শুয়ে ছিল যোগিন কাকা। পাশে রেডিও বাজছিল।

আমার কথা শুনতে পেয়ে নিজেই উঠে এসে বলল কে এসেছিস? রেণু এসেছিস? আয় বাবা ভেতরে আয়। — তারপর খবর কি বল। কেমন আছিস তোরা সব। বাপরে কত বড় হয়েছিস। তারপর বাবা মা সব কে কেমন আছে বল। আমার কথা তোদের এখনও মনে আছে দেখছি।

বসলাম দড়ির খাটিয়াতে।

বললাম কি করছিলে যোগিন কাকা?

যোগিন কাকা বলল — কি আর করব খবর শুনছিলাম আর কি।

আমি বললাম — তুমি কেমন আছো বলো। কিন্তু তুমি তো ওদিককার তেঁতুল তলায় মনসা ঢিবির কাছে থাকতে। তা এখানে উঠে

এলে কি করে?

যোগিন কাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল সে অনেক কথা। তোরা চলে যাবার পর গোবর্দ্ধন বাবুরা আমার ওই বসত ভিটেটুকুও কেড়ে নিল। জোর করে ঘর বাড়ী ভেঙ্গে দিল। ওই ভিটেতে ওরা আলুক্ষেত করেছে। আর তোদের সেই সখের আমবাগানটা, সেটা বিক্রী করে দিয়ে গাছ কাটিয়ে চাষবাস করছে অন্য লোক। গ্রাম পঞ্চায়েত ওদের হাতে। অনেক কষ্টে গ্রামের আর দশজনার সুপারিশে নতুন পুকুরের পাড়ে মাথা গোঁজবার এই জমিটুকু পেয়েছি।

তারপর জিজ্ঞাসা করলাম তা এটা কে হয়, তোমার মেয়ে?

— হ্যাঁ, ওটা আমার শ্যামলী মা। বড় দুঃখী।

ছেলেবেলাতেই ওর মা মারা যায়। তারপর একটু ডাগর হতেই একটা ভাল পাত্র দেখে ওর বিয়ে দিয়েছিলাম। ঘরজামাই করেছিলাম ছেলেটাকে। দুটিতে কি ভাবই না ছিল। কি মিল মিশ। সব সময় আনন্দে আর স্ফূর্ত্তিতে ডগমগ থাকত দুজনে।

যোগিন কাকা বলতে লাগল — সারাদিন ক্ষেতে খামারে, মাঠে কত কাজই না করত। ধান বোনা, ধান কাটা, ধান ঝাড়া এ সবই করত। সখ করে ওরা দুটো রাজহাঁস পুযেছিল। কিন্তু অত সুখ সইল না অভাগীর কপালে। ক্ষেতে কাজ করতে করতে কাল কেউটেতে কাটল জামাইটাকে। বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটা। জামাইকে বাঁচাতে রোজা, হাসপাতাল সবই করেছিলাম। কিন্তু বাঁচলো না। যোগিন কাকা কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছল।

এর অল্প ক'দিন পরেই শ্যামলীর রাজহাঁসটাও মারা গেল। শ্যামলী আরও ভেঙে পড়ল। তারপর কত বার বলেছি ওকে। ওসব থান পরা ছাড়। রঙীন পর। মনটাকে শক্ত কর। বললে আমি তোর আবার বিয়ের চেষ্টা করব। — তা মেয়ে আমার মোটেই রাজী নয়।

একবার মেলা দেখতে গিয়ে দুজনে একটা ছবি উঠিয়েছিল। মেয়ের আমার, ওই জামাইয়ের ছবিটাই সম্বল। এই সবই খবর। তা রেণু বাবু এতদিন পরে জন্মভিটে দেখার কথা মনে পড়ল। দেরী করে ফেলেছিস

বাবা, বড় দেরী করে ফেলেছিস। এ সব জমি জায়গা বিক্রী বাটা না করে যদি এখানে থেকেই লেখাপড়া করতিস তবে দেশের বাড়ীর এই জমির এ হাল হোতনা। এখন এখানকার জমির দাম কত হয়েছে জানিস। পাঁচ হাজার টাকা করে কাঠা। আর তোর বাবা সব কিছু ঘুচিয়ে অকারণ চলে গেল।

বললাম যোগিন কাকা এবার তুমি থামো। আমি আর কিছু শুনতে চাই না। অমি আমার স্বপ্নের, শৈশবের সেই জন্মভিটেটুকু দেখতে এসেছিলাম এই শেষ বয়সে। তা যা দেখলাম তাতে আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। এখন বুঝছি না এলেই ভাল করতাম।

শ্যামলী এল চা নিয়ে। বলল আপনার চা।

চায়ের প্লেটটা হাতে তুলে নিয়ে বললাম — শ্যামলী তোমার সঙ্গী সাথীটি কোথায় গেল?

শ্যামলী বুঝতে পারল না।

যোগিন কাকা বুঝিয়ে দিল। রেণু বলছে তোর রাজহাঁসের কথা। তাই তো বাবাজী?

ঠিক তাই।

শ্যামলী বলল — ওই যে আমার বিছানায় শুয়ে ঘুম মারছে। শ্যামলী গিয়ে রাজহাঁসটাকে কোলে তুনে নিল। হাঁসটা শ্যামলীর কোল থেকে নেমে ওর গলায় মুখে বুকে ঠোঁট ঠেকিয়ে চুম্ দিল।

ইত্যবসরে আমি স্বভাবসুলভ চরিত্রে শ্যামলীকে আর তার সঙ্গী সাথীকে ধরে রাখলাম আমার ক্যামেরায়। শ্যামলী আপত্তি কবেনি ছবি তোলাতে। হ্যাঁ সেই আলোকচিত্র গুলোরই বিশেষ একখানা ছবি এবার স্থিরচিত্র প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান পেয়েছে। পেয়েছে আন্তর্জাতিক সম্মানও। What a mysterious love it is? সত্যি এ কি অপূর্ব প্রেম।

যোগিন কাকা বলেছিল শ্যামলী মা তার নিজের মানুষকে হারিয়ে শ্যামলকে নিয়ে (ওই রাজহাঁসকে নিয়ে) দিনরাত পড়ে আছে। কি বিচিত্র ওদের প্রেম।

রাজা-রাণীর গল্পো

এক ছিল রাজা।

রাজা শুধু নামেই রাজা।

রাজার না ছিল কোন প্রজা, না ছিল কোন মন্ত্রী, না সেনাপতি, না কোন সৈন্য সামন্ত।

রাজার না ছিল রাজ অট্টালিকা, না প্রাসাদ, না কোন দাস-দাসী, না কোন রাণী।

রাজা শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখত। তার এক রাণী হয়েছে, হয়েছে এক চলন্ত রাজবাড়ী, এক রাজপুত্তুর আর এক রাজকন্যা।

আসলে এই রাজা শুধু নামেই রাজা। বলতে গেলে এক উলঙ্গ রাজা। নিঃস্ব বিত্তহীন গরীব অতি সাধারণ এক মানুষ।

এমনই একজন সাধারণ মানুষ যে এই রাজার নামের পিছনে কোন পদবী পর্যন্ত জোটে নি। রাজা নিজেই জানে না বা মনে নেই কে ছিল তার বাবা আর কেই বা ছিল তার মা। কোথায় ছিল তাদের ঘর-বাড়ী। এসব কিসসু মনে নেই রাজার।

তবে এইটুকু মনে পড়ে যখন সে হাফপ্যাণ্ট পরত তখন থেকেই সে একটা চায়ের দোকানে কাজ করত।

দোকানটা ছিল একটা বড় রাস্তার ধারে।

সেখানে কত রকমের গাড়ী এসে দাঁড়াত। কারণ দোকানের পাশেই ছিল একটা মোটর গ্যারেজ। গাড়ীগুলো এই গ্যারেজে এসে টুকিটাকি কত কি সব রিপেয়ার এর কাজ করাত তারপর এই চায়ের দোকানে বসে চা বিস্কুট খেয়ে ওপাশের পেট্রল পাম্প থেকে গাড়ীতে তেল ভরে নিয়ে আবার হুস করে বেরিয়ে যেত যে যার গাড়ী নিয়ে।

আট-ন' বছরের রাজা ক্রমে বড় হয়ে উঠল।

আরও আট বছর পরে এক জোয়ান মদ্দ হয়ে উঠল। সুন্দর সুঠাম চেহারার এক নব্য যুবক। হাফ প্যাণ্ট ছেড়ে ফুল প্যাণ্ট ধরেছে। শুধু তাই নয় চায়ের দোকানের চাকরী ছেড়ে দিয়ে পাশের মোটর গ্যারেজে

কাজে ঢুকেছে। ইতিমধ্যে ভাল কাজকর্মও শিখে নিয়েছে রাজা। তেল চিটচিটে গেঞ্জী আর ফুল প্যাণ্ট পরে অনায়াসে বাস মিনিবাস, ট্রাকের তলায় ঢুকে অতি সহজে গাড়ীর বিবিধ রিপেয়ারিং-এর কাজ কর্ম করে দিতে তার এতটুকু কষ্ট হয় না।

গ্যারেজের মালিক ছিলেন একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। নাম সর্দার হরগোবিন্দ সিং। বয়স পঞ্চাশ উর্দ্ধ। রাজার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে একদিন হরগোবিন্দ সিং রাজাকে বলে বসলেন রাজা তুই ড্রাইভিং শিখবি?

রাজাতো মহাখুশী একথা শুনে। বলল গুরুজী কবে থেকে শেখাবেন আমায় ড্রাইভিং?

রাজা হরগোবিন্দ সিংকে শুধুই গুরু বলে ডাকে—।

হরগোবিন্দ সিং বললেন চল আজ থেকেই তোকে ড্রাইভিং এ হাতে খড়ি দিয়ে আসি।

হরগোবিন্দ সিং বললেন—ভাল একটা মারুতি কার এসেছে হাতে। মালিক গাড়ীটা কাল ফেরৎ নিতে আসবে। গাড়ীর রিপেয়ারিং এর কাজ হয়ে গেছে। আজ তোর জন্য বুকড্ ওই গাড়ী।

রাজা একথা শুনে আহ্লাদে আটখানা। হরগোবিন্দ সিংয়ের পায়ের ধূলো নিয়ে বসল হঠাৎই। বলল আমি ময়লা এই প্যাণ্ট আর গেঞ্জীটা ছেড়ে আসছি গুরুজী।

একটু পরেই রাজা এল। পরিষ্কার জামা প্যাণ্ট পরে। হরগোবিন্দ সিং বললেন—নে ওঠ। ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বোস। আমি পাশেই বসছি। যা বলব, যা দেখাব ভাল করে দেখবি, শুনবি। আর সেই মত কাজ করবি। ড্রাইভিংটা এমন একটা কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

হরগোবিন্দ সিং তার শিষ্য রাজাকে নিয়ে মারুতি কারে স্টার্ট দিল।

মারুতি চলতে শুরু করল।

গাড়ী ছুটল। ফার্স্ট গীয়ার, সেকেণ্ড গীয়ার, থার্ড গীয়ার আবার ফার্স্ট গীয়ার। ব্রেক, হর্ণ, স্পীডোমিটার এক্সিলেটর, ফুল ব্রেক সবের কাজই দেখিয়ে দিলেন সিংজী। তাছাড়া রাজার হাত দুটোকে নিজের

হাতের মধ্যে চেপে ধরে স্টিয়ারিং ঘোরান ফেরানোর কাজও শিখিয়ে দিলেন। আর কেমন করে সামনে আসা গাড়ীকে পাশ দিতে হয়, ওভারটেক করা গাড়ীকে কেমন ভাবে পাশ দিতে হয় এ সবও শিখিয়ে দিলেন। তা প্রায় ৮/১০ মাইল প্র্যাকটিস ট্রেনিং করিয়ে সিংজী যখন বুঝলেন রাজা নিজেই গাড়ী চালাচ্ছে ঠিক ঠাক তখন হঠাৎ বলে উঠলেন সাবাস রাজা। বহুৎ আচ্ছা বেটা! আমি কখন স্টিয়ারিং থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছি তুই বুঝতেই পারিস নি।

রাজা হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়ী থামাল।

রাজার চোখে মুখে আনন্দ যেন ছিটকে পড়ছে। সে যেন একটা বিরাট যুদ্ধ জয় করে ফেলেছে। তার জীবনের স্বপ্নই ছিল সে একদিন গাড়ী চালানো শিখবে। তারপর বাস, ট্যাক্সি, ট্রাক যাতে কাজ জুটবে তাতেই লেগে পড়বে।

তারপর আর কি — কেবল গাড়ী চাপা।

এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তা। এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে। বিভিন্ন সড়ক, বিভিন্ন নগর, শহরে কেবল ঘুরে বেড়ানো। কেবল গাড়ী চেপে বেড়ানো।

রাজাকে চুপ করে থাকতে দেখে সিংজী বললেন— 'কি রে রাজা চুপ চাপ হয়ে গেছিস কেন? কথা বলছিস না কেন? কি এত চিন্তা ভাবনা ঢুকল মাথার মধ্যে?'

—না গুরুজী। একটু অন্য কথা ভাবছিলাম আর কি।

সিংজী বললেন —নে চল্ এবার ফেরা যাক্। কাল আবার গাড়ীটা ফেরৎ দিতে যেতে হবে, যদি না মালিক আসেন। গাড়ীটা কিন্তু জব্বর, কি বলিস রাজা? স্টিয়ারিং এ হাত দিলেই মনে হবে প্লেন চালাচ্ছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিংজী বললেন ওই শখটা আর মিটল নারে রাজা। আমারও একটা স্বপ্ন ছিল ওই রকম প্লেন চালাব। আকাশে পাখীর মত উড়ে বেড়াব। কিন্তু হোল না। নে চল্ এবার। ফিরতি রাস্তাটা তুই ড্রাইভ কর। ভরিস না। দেখি কেমন শিখলি তুই গাড়ী চালানো।

রাজা সিংজীর কথা মত গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দিল। মুহূর্তে

পাকাপোক্ত ড্রাইভারের মত গাড়ী চালিয়ে রাজা তার গুরুজীকে নিয়ে নিজেদের ডেরায় ফিরল।

গাড়ী থেকে নেমেই রাজা সিংজীকে আবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। সিংজী রাজার মাথায় হাত রেখে বললেন তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক এই কামনা করি।

এবার বলি এক রাণীর গল্প।

এক যে ছিল রাণী।

এই রাণী কোন রাজার বেটি না হলেও মস্ত এক বড়লোকের বেটি।

রাণীর বাবা একজন নাম করা ফরেষ্ট অফিসার। নাম শিবশঙ্কর রায় চৌধুরী। রাণীর মা নেই। ছোট বেলায় রাণীর মা মারা গেছেন। শিবশঙ্কর বাবু তার মেয়ে রাণীকে ছোট বেলা থেকে আদর আহ্লাদে রেখে যেমন লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তেমনই ঘোড়ায় চড়া, মোটর ড্রাইভিং, সাঁতার কাটা, বন্দুক চালানো, ক্যারাটে এসবও শিখিয়েছেন।

রাণীদের বাড়ীতে কত দাস দাসী।

সবাই রাণীর কথায় ওঠে বসে। রাণীকে তারা একধারে যেমন ভয়ও করে তেমনি আবার ভালও বাসে।

শিবশঙ্কর বাবুও তার মেয়েকে খুবই ভালবাসেন। মেয়ে রাণীর যখন যা পছন্দ, যখন যা বলে বা করে শিবশঙ্কর বাবু তা মেনে নেন। কোন প্রতিবাদ করেন না।

এই রাণীর জন্যই কেনা হয়েছিল একটা মারুতি গাড়ী।

রাণী বড় হয়েছে। সে একাই হাজারীবাগের ওই ঢেউ খেলান পিচ ঢালা রাস্তা দিয়ে একা স্কুলে যেতে পারে, বাড়ী ফিরতে পারে। কোন বডিগার্ডের প্রয়োজন মনে করে না।

একদিন নতুন কেনা এই মারুতির এক্সিলারেটরটা ঠিকমত কাজ না করাতে শিবশঙ্কর বাবু গাড়ীটাকে হাজারীবাগের স্টেশন ধারের ওই সিংজীর গ্যারেজে দিয়ে এসেছিলেন। বলে এসেছিলেন গাড়ীটা হয়ে গেলে যেন সিংজী ওটাকে বাংলোয় পৌঁছে দেয়।

সিংজী বলেছিলেন অবশ্যই পৌঁছে দেব হুজুর। কিন্তু বিশেষ কোন কারণে পরের দিন হরগোবিন্দ সিং নিজে শিবশঙ্কর বাবুর গাড়ীটি দিতে যেতে পারেন নি। কাজেই মারুতি কারটিকে রাজাই চালিয়ে নিয়ে এসেছিল শিবশঙ্কর রায় চৌধুরীর ডাক বাংলোয়।

গাড়ী বারান্দায় গাড়ী ঢুকিয়ে দু-বার হর্ণ বাজাতেই ছুটে এসেছিল রাণী। পরে স্বয়ং শিবশঙ্কর বাবুও।

রাজা শিবশঙ্কর বাবুর হাতে রিপেয়ারিং চার্জের বিলটা দিতেই উনি রাণীকে বললেন ওকে একশোটা টাকা এনে দিতে।

রাণী ছুটে গিয়ে একশোটা টাকা এনে রাজার হাতে দিয়ে বলল এই নাও ধর।

রাজা টাকাটা রাণীর হাত থেকে নিল।

টাকাটা হাতে পেয়ে রাজা টাকাটাতে একটা চুমু খেল।

রাণী তা দেখল।

হাসল। বলল এই ড্রাইভার তোমার নাম কি?

রাজা বলল —'রাজা।'

রাণী বলল — বাঃ বেশ নাম তো তোমার।

রাজা হঠাৎই বলে বসল আপকা নাম মেম সাব?

রাণী বলল — রাণী।

রাজার মনে তোলপাড় শুরু হোল।

মেয়েটার নাম রাণী। তার স্বপ্নে দেখা সেই রাণী। আহা কি সুন্দর নাম। কি সুন্দরই না দেখতে রাণীকে। কি সুন্দর চোখ, কি সুন্দর চুল ' কি সুন্দর মুখশ্রী আর তার হাসি।

রাজা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

রাণী বলল— এই ড্রাইভার চলত দেখি গাড়ীটা কেমন সারা হয়েছে একবার দেখে নিই। উঁহু তুমি নয় আমি ড্রাইভ করব। তুমি এদিকে এসে বসো।

শিবশঙ্কর বাবুর দিকে তাকিয়ে রাণী বলল ড্যাডি আমি এখনি আসছি— টা-টা।

শিবশঙ্কর বাবু হাত নাড়লেন বললেন —বাই।

মারুতি গাড়ীতে চেপে রাজা রাণী দুজনেই বেরিয়ে গেল ফটক পেরিয়ে।

গাড়ী চলছে। দু-পাশে শুধু বড় বড় গাছ। তার মাঝখান দিয়ে মসৃণ রাস্তা চলে গেছে রাঁচী, হাজারীবাগ ফরেষ্ট ওদিকে দুমকা বর্দ্ধমান আসানসোল।

রাস্তায় গাড়ী চালাতে চালাতে রাণী প্রশ্ন করল — তুমি ওই একশ টাকা দিয়ে কি করবে?

রাজা বলল — কি আর করব একটা মিনিবাস কিনব।

রাণী হো হো করে হেসে উঠল। বলল এই একশ টাকা দিয়ে মিনিবাস কিনবে? বুদ্ধু কোথাকার।

রাজা ঢোঁক গিলে এবার বলল — প্রথমে এটা দিয়ে আমি একটা বাম্পার লটারীর টিকিট কিনব।

রাণী ঘাড় বেঁকিয়ে বলল — বাঃ খুব ভাল কথা। তারপর লটারীতে টাকা উঠলে কি করবে?

রাজা বলল — মিনিবাস কিনব। রাজা আরও বলল মিনিবাস কিনে ওতেই আমি চলন্ত ঘর সংসার পাতব। তারপর কেবল ঘুরে বেড়াব। দিল্লী, মাদ্রাজ, মুম্বাই, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, খাজুরাহ, পশ্চিমবাঙ্গাল।

রাণী বলল বাঃ। খুব ভাল কথা। তা তুমি দেখছি দিনের বেলাতেও স্বপ্ন দেখ। তা বিয়ে থা করবে না?

রাজা লজ্জামাখা মুখে বলল আপনার মত মেয়ে পেলেই বিয়ে সাদি করব নচেৎ নয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ মেম সাব। এটা মরদকা বাত।

—তা তোমার ইচ্ছে তো বড় মন্দ নয়। আচ্ছা ধর আমি যদি তোমায় বিয়ে করতে চাই তুমি বিয়ে করবে?

রাজা চুপ করে থাকে, আর কিছু বলে না।

রাণী বলে 'তোমার আর কে আছে?'

রাজা বলে আমার নিজের বলতে কেউ নেই।

মা নেই, বাবা নেই, আছে শুধু গুরুজী। স্টেশন ধারে হরগোবিন্দ সিংজীর মোটর গ্যারেজ। আমি ওখানেই গুরুজীর কাছে থাকি।

রাণী প্রশ্ন করে তুমি কতদূর লেখা পড়া শিখেছ?

রাজা বলে 'তেমন কিছু শিখিনি। তবে মিশনারী স্কুলে গিয়ে একটু আধটু ইংরাজী ও বাংলা লিখতে ও পড়তে শিখেছি।

'তাই নাকি! আচ্ছা তুমি আমার এই হাতে আমার নামটা ইংরাজীতে লেখ দেখি।' —রাণী তার বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

রাজা তার পকেট থেকে ডট পেনটা বার করে রাণীর হাতে লিখে দিল Rani এবং আরও লিখে দিল - I Love You.

রাণী খুব খুশী। আবার রাগও হোল ওই বেশী লেখার জন্য। বলল তুমি ওটা লিখলে কেন। বদমাইস্।

রাজা মাথা হেঁট করল।

রাণী বলল এবার তুমি নেমে যাও। আমি একাই ফিরতে পারব। আর তোমার সাধের গাড়ী কেনা হলে পর আমার সাথে দেখা করো।

এরপর আর কি।

রাজা রাণীর গল্প প্রায় শেষ হতে চলল। তবে বাকী ঘটনা গুলো না বললে গল্পের শেষ হয়ই বা কি করে। তাই গল্পের শেষটুকু বলা। —

রাজা সত্যি সত্যিই সেবার একশ টাকা দিয়ে দশটা কালী পূজো বাম্পার টিকিট কেটেছিল। তারপর ভুলেও গিয়েছিল টিকিট কাটার ব্যাপারটা।

কিন্তু রাজার কপাল ভাল।

সত্যি সত্যি ওর কেনা একটি টিকিটে প্রথম পুরস্কার উঠল বিশ লাখ টাকা।

আর যায় কোথা। হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার।

রাজা তো আনন্দে আটখানা। হরগোবিন্দ সিং এর আনন্দও কম নয়।

হরগোবিন্দ বললেন — রাজা, ভগবান জিসকো দেতা ছপ্পড়

ফাড়কে এসাহি দেতা হ্যায়। ভগবানকে লাখো সেলাম জানা বেটা। তোর স্বপ্ন সার্থক হোক বেটা এ আশীর্বাদ করি। চল দেখি যাই এজেন্টের কাছে। কিভাবে টাকাটা তোলা যায় দেখি। এরপর ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। তার পর তোর সখের গাড়ী মিনিবাস কেনা।

রাজা বলল গুরুজী বাসটা আমি আমার মনের মত করে ডিজাইন করিয়ে তৈরী করাব। সামনের দিকে ড্রাইভারের কম্পার্টমেণ্টে শুধু আমরা থাকব। আমাদের ঘর সংসার। চলন্ত ঘর বাড়ী বাসা। সেখানে পাবলিক নট এলাউড। আর বাকিটা যেমন হয় তেমনি। আপনি বরং এজেন্টের কাছে যান এই টিকিটটা নিয়ে। আমি ফরেষ্ট বাংলোয় গিয়ে রাণীকে খবরটা দিয়ে আসি। কিন্তু আজ তো একটা গাড়ীও নেই যে ড্রাইভ করে যাব ওখানে। শুধু আপনার মোটর বাইকটা।

হরগোবিন্দ সিং বললেন —যা বেটা তুই ওটাই নিয়ে চলে যা। আমি এদিকটা দেখছি।

রাজা মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিল।

মোটর সাইকেল ছুটছে। রাজা ছুটছে, তার স্বপ্ন ছুটছে। বন্ বন্ করে মোটর সাইকেলের চাকা ঘুরছে। রাজার স্বপ্নের চাকাও বন্ বন্ করে ঘুরছে। উঃ বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে এই আট মাইল রাস্তা পার হতে। রাজার মন তোলপাড়।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত রাজা শিবশঙ্কর বাবুর ডাক বাংলোর ফটকে এসে পৌঁছল।

গেটের দরোয়ান রাজাকে চেনে। তবু সে টেলিফোন করে রাজার উপস্থিতির কথা জানিয়ে গেট খুলে দিল।

লাউঞ্জে বাইকের শব্দ শুনেই 'কে' বলে রাণী এসে দাঁড়াল হাসিমুখে। বলল কি ব্যাপার রাজা, তুমি এই সাত সকালে এখানে?

রাজা বলল ভাল খবর মেম সাব। আমি লটারী জিতেছি মেম সাব। আমার টিকিটে ফার্স্ট প্রাইজ উঠেছে। হ্যাঁ মেম সাব —বিশ লাখ টাকা।

রাণী বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বলল সত্যি?

রাজা বলল সত্যি!

রাণী বলল খুব ভাল কথা। তুমি দাঁড়াও, আমি বাবুজীকে খবরটা দিয়ে আসি। বাবুজীর খুব অসুখ নইলে তিনি নিজেই এতক্ষণ ছুটে আসতেন। —তা তুমিও এস না, আমার সঙ্গে।

রাজা যেন ধন্য হয়ে গেল।

রাণীর সঙ্গে তাদের ডাক বাংলোর অন্দর মহলে গিয়ে রোগ শয্যায় শায়িত শিবশঙ্কর বাবুকে প্রণাম করল।

শিবশঙ্কর বাবু হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন —তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। ভগবান তোমার ভাল করুন। তারপর রাজা তুমি কি করবে ভেবেছ অত টাকা দিয়ে? শিবশঙ্কর বাবু প্রশ্ন করেন।

রাজা শিবশঙ্কর বাবুর মাথার কাছে সরে এসে বলে খুব ছোট বেলা থেকেই আমার একটা সখ ছিল। একটা চলন্ত ঘর-বাড়ী বানাব। তা ভেবেছি একটা খুব সুরত মিনিবাস বানাব। ওতেই থাকা খাওয়ার সব বন্দোবস্ত থাকবে। আবার পিকনিক পার্টি, ম্যারেজ পার্টি নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত থাকবে। লাক্সারি মিনিবাস। এই আমার স্বপ্নের ঘর বাড়ী এতে করেই আমি সারা দেশ ঘুরব। সারা ভারত ঘুরব। ইনকাম্ ভি হবে। —কেমন হবে বাবুজী?

খুব ভাল হবে। শিবশঙ্কর বাবু বললেন। আরও বললেন— বাসটা তৈরী হলে পর একদিন নিয়ে এসে দেখাও কেমন হোল তোমার মিনিবাস। আমার নামেই বুক করা থাক প্রথম ট্রিপটা। প্রথম দেশ বিদেশ ভ্রমণে আমরাই যাব তোমার লাক্সারী বাসে চড়ে —মনে থাকে যেন। এখন এস।

এরপর রাজা হরগোবিন্দ সিং এর সহযোগিতায় এক মাসের মধ্যে লটারীতে পাওয়া টাকা তুলে সত্যি সত্যি একটা মডেল লাক্সারী মিনিবাস কিনে ফেলল। ইতি মধ্যে ওর গুরুজী রাজার নামে একটা লংরুট সার্ভিস এর পারমিটও করিয়ে দিয়েছে যাতে করে হাজারীবাগ হয়ে পাটনা-রাঁচী মধ্যপ্রদেশ দিল্লী সব যাওয়া যাবে।

এরপর একদিন রাজা মিনিবাসটা হাতে পেয়েই নিজে চালিয়ে

নিয়ে শিবশঙ্কর বাবুর ডাক বাংলোতে এসে হাজির।

রাজা হর্ণ বাজাল বাইরে থেকে।

একবার, দুবার, তিনবার।

কিন্তু কেউ এল না।

কেউ মানে রাণী এসে আজ আর স্বাগত জানাল না। কারণটা এদিনই ভোর রাতে শিবশঙ্কর বাবু হার্ট স্ট্রোক হয়ে মারা গেছেন। বডি তখনও ভেতরে পড়ে। খবর পেয়ে রাজা ভেতরে গেল।

দেখল শিবশঙ্কর বাবুর বুকের উপর উপুড় হয়ে পড়ে রাণী কাঁদছে। কাঁদছে কত দাস দাসী।

রাজা হায় হায় করল। রাণীর সঙ্গে রাজাও কাঁদল। বেদনায় তার সমস্ত স্বপ্ন যেন চূরমার হয়ে যেতে বসল।

তারপর আর কি।

মহা সমারোহে শিবশঙ্কর বাবুর সৎকার সম্পন্ন হোল। যথা নিয়মে শ্রাদ্ধ শান্তি চুকল।

এরপর একদিন সদাশিব বাবুর পারসোনাল এটর্নি ভক্তিভূষণ গাঙ্গুলী রাণীকে ডেকে বললেন রাণী মা এবার যে তোমায় আমার কাছে এসে একটু বসতে হবে।

রাণী এসে ভক্তিভূষণ বাবুর পাশে বসল।

ভক্তিভূষণ বাবু বললেন তোমার বাবা মারা যাবার আগেই এই চিঠিটা রেখে গেছেন। তুমি পড়ে দেখতে পার।

রাণী লেখাপড়া জানা মেয়ে। শোক সন্তপ্ত হলেও তার বাবার লেখা শেষ চিঠিখানা ভাল করেই পড়ে দেখল। যতই পড়ে ততই রাণী আশ্চর্য হয়ে পড়ে।

চিঠিতে শিবশঙ্কর রায় চৌধুরী রাণীর জন্ম বৃত্তান্তের কথাও উল্লেখ করে বলেছেন রাণী মা, তুমি আমার আদরের পালিতা কন্যা বিশেষ। তোমাকে আমি ও আমার স্ত্রী একদা পথের ধার থেকে কুড়িয়ে পাই। তোমার জাত ধর্ম কিছুই আমরা জানতে পারি নি। এবং যেহেতু আমরা অপুত্রক ছিলাম তাই তোমাকে আমরা এতাবৎ আমাদের কন্যা রূপেই

লালন-পালন করেছি। আমরাই তোমার নাম দিই রাণী বলে। প্রসঙ্গতঃ বলি আমি খুবই লিবারেল মাইণ্ডেড লোক। তুমি যাকে পছন্দ করে বিয়ে করতে চাও করতে পারো। জাতি ধর্ম, মানা না মানা তোমার ব্যাপার বা ইচ্ছে। তবে সবাই আমরা একই ভগবানের সন্তান। আমি ইদানীং লক্ষ্য করছিলাম তুমি রাজা নামে ওই ছেলেটার প্রতি বেশ একটু আসক্ত হয়ে পড়ছিলে। তাই আমি নিজেই লিখিত ভাবে একথা জানিয়ে দিয়ে গেলাম যে যদি সত্যিই রাজাকে তোমার মনে ধরে ওকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করে রেজেস্ট্রি বিয়েটা প্রথমে করে নিও পরে রাজার মন পছন্দভাবে দুজনে ঘরসংসার বেঁধে ঘর করো। তোমাদের দু'জনার প্রতি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ রইল। আর দেওয়ান কেশব ভট্টাচার্য্যের কাছে রইল আমার স্টেটের যাবতীয় দলিল-পত্র। সেখানেও সব কিছু তোমার নাম বরাবর করে রেখে গেলাম। এখন থেকে তুমি তোমার ইচ্ছামত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রইলে। আমার অবর্তমানে তোমরা এখান থেকে উঠে গিয়ে স্টেটের বাড়ীতেই বসবাস করবে এটাই আমার শেষ ইচ্ছা।

ইতি

তোমার পালক পিতা শিবশঙ্কর রায় চৌধুরী।

শিবশঙ্কর বাবুর মৃত্যুর পর রাণী খুবই ভেঙ্গে পড়ে ছিল। তবুও সবদিক সামাল দিতে রাণী নিজেকে অচিরেই তৈরী করে নিয়ে রাজাকে ডেকে পাঠাল।

রাজা এল।

রাণী দেওয়ান কেশব ভট্টাচার্য্য এবং এটর্নী ভক্তিভূষণ গাঙ্গুলীর সামনে রাজার হাতে একটা হীরের আংটী পরিয়ে দিল। বলল রাজা তুমি জান বাবা চলে গেছেন। বাবা চিঠি লিখে তার মনের কথা লিখে গেছেন এবং একটা দলিলও দিয়ে গেছেন। কাজেই বাবার শেষ ইচ্ছা মতো আমি তোমাকে এঁদের দু'জনার সামনে আমার স্বামী রূপে স্বীকার করে নিচ্ছি তুমিও আমায় গ্রহণ কর।

রাজার স্বপ্ন যে এমন মূর্তহয়ে দাঁড়াবে এতটা সে অবশ্যই ভাবেনি। তবুও রাণীর কথা মত এগিয়ে এসে রাণীর হাত ধরে বলল রাণী, আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি। বাবার ইচ্ছামতো আমি তোমাকে আমার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলাম। পরে রাজা তার নিজের হাতের আংটিটা রাণীর হাতে পরিয়ে দিল।

দেওয়ানজীর পরামর্শ মতো এদিন ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন অফিসারও এসে ছিলেন। তিনি তাঁর বাকী কর্তব্যটুকু করিয়ে নিলেন। পরে ওই খানেই সাধারণ মতে উপস্থিত সবার মাঝে মাল্যদান পর্বটুকুও সম্পন্ন হোলো।

তিনদিনের মাথায় রাজার গুরুজী হরগোবিন্দ সিং এলেন নতুন কেনা নতুন ডিজাইনের সেই লাক্সারী মিনিবাসটি নিয়ে। যার বডিতে লেখা আছে রাজারাণী পিকনিক বাস। পাটনা রাঁচী হাজারীবাগ দিল্লী। গাড়ীটা আষ্টে পৃষ্ঠে ফুল দিয়ে সাজানো। একে নতুন গাড়ীর উদ্বোধন তাতে আবার সত্যিকার রাজারাণীর হনিমুন যাত্রা।

বিকেল হবার আগেই ডাক বাংলোর আশ পাশের সব প্রতিবেশীরা এসে এদেরকে আশীর্বাদ করল। শুভেচ্ছা জানালো। রাজারাণী, ভক্তিভূষণ ও কেশব বাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে গাড়ীতে উঠল।

রাজা রাণী হঠাৎ গাড়ী থেকে নেমে এল।

একটু দূরে হরগোবিন্দ সিং চোখের জল মুছছিল। রাজা রাণী এসে হরগোবিন্দ সিংকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

রাজা বলল গুরুজী আপহি মেরা গুরু, মেরা পিতা, আশীর্বাদ কিজিয়ে। মেরা স্বপ্ন সার্থক হুয়া কেবল আপহিকা দেখ ভালকে লিয়ে।

হরগোবিন্দ সিং রাজা রাণীর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল। বলল যাও বেটা। ফিন লোটনা শিগঘিরই।

রাজা এসে বাসের স্টিয়ারিং ধরল। রাণীকে প্রশ্ন করল আগে কোথায় যাবে বলো — দিল্লী আগ্রা মথুরা না রাজস্থান?

রাণী বলল —বুদ্ধু কোথাকার। হনিমুন করতে কেউ এই গরমে ওসব জায়গায় যায়। চল যাই সিমলা। যাওয়া যাবে তো?

রাজা রাণীকে কাছে টেনে নিয়ে বলল নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে। তারপর দেখ কেমন মনের মত করে চলন্ত ঘরবাড়ী বানিয়েছি। আমাদের ছেলে-মেয়ে হলেও এই গাড়ীতে এখানেই থাকবে ওরা। এখন কেমন হয়েছে বলো, তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

রাণী বলল খুব ভাল হয়েছে। এখন দেখে গাড়ী চালাও।

রাজা-রাণীর গল্পটি ফুরোল। নটে গাছটি মুড়োল।

গণশা ও পটলার ছোটবেলার গপ্‌পো

গণশা ও পটলার মনে ভীষণ দুঃখ।

তাদের দুঃখ রাতে তারা ঘুমতে পারে না। আসলে ঘুম আসে না কিছুতেই।

গণশা আর পটলার বাড়ী হালিশহর।

দু'জনেরই বয়স ৭ বা ৮-এর কাছাকাছি। সমবয়সী। দু'জনের মধ্যে খুব ভাব।

গণশার ঠাকুরমা মারা গেছে এক মাস আগে। পটলার ঠাকুরদা মারা গেছে ছ'মাস হলো।

গণশা ও পটলার আগে ঘুম হোত। কারণ রোজ রাতে গণশার ঠাকুরমা আর পটলার ঠাকুরদা তাদেরকে গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াত।

বলতে ভুল হয়েছে গণশার আবার মাও নেই। বাবা আছে। বাবাটা আবার বিয়ে করেছে। সৎ মা গণশাকে দেখতে পারে না। না কাঁদলে তো খেতেই দেয় না। তারপর সব সময় বকাঝকা আর দূর ঝ্যাঁটা করে।

তবে গণশার সব দুঃখ দূর হয়ে যায় যখন গণশা তার ঠাকুরমার কাছে গিয়ে সৎমার কীর্তিকলাপের সব কথা বলে। গণশার সৎমা নিজে গোগ্রাসে কত কিছু খায় অথচ গণশা না কাঁদলে চারটি ভাতও দেয় না। মারধোর করে। একটুও হেসে কথা বলে না কখনও। ভাগ্যিস ঠাকুরমাটা ছিল তাই আগে রাতে একটু ঘুম হোত। কারণ ঠাকুমা কাদম্বরীদেবী নাতিকে ঠাকুরমার ঝুলি থেকে কত গল্প কথাই না শোনাত। মন থেকে তৈরী করেও কাদম্বরী-দেবী নাতিকে গল্প কথা শোনাত।

পটলারও প্রায় একই সমস্যা। মা থেকেও মা নেই। বাবা মায়ে নিত্য ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। অভাবের সংসারে যা হয়। কোথা থেকে আসবে পয়সা। দৈনিক চাল, ডাল, নুন-তেল কিনতেই সব পয়সা ফুরিয়ে যায়। তারপর নিত্য চার জনের বাজার। হ্যারিকেনের জন্য কেরোসিন তেল, গরুটার জন্য বিচলি যোগাড় করা কত কি। এসব কি শুধু রিক্সা

চালিয়ে হয় ।

পটলার বাবা তো নিরুপায় ।

পটলা এসব বুঝে চুপ করে সহ্য করে যায় এমন কি ক্ষিদে পেলেও বলে না । খুব ক্ষিদে পেলে এক গ্লাসের বদলে দু'গ্লাস জল ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নেয় ।

পটলার ঠাকুরদার বয়স হয়েছিল নব্বই ।

পটলা ঠাকুরদার কাছে স্নেহভালবাসা সবই পেত। আর পেত চারটি করে মুড়ি।

পটলার ঠাকুরদা তিনকড়ি ঘোষ রোজ রাতে পটলাকে ঘুম পাড়ানি গল্প শোনাত । রাজা-রাণীর গল্প, মহাভারতের গল্প, রামায়ণের গল্প কত কিছুই না শোনাত।

পটলার সেই ঠাকুরদা মারা গেছে মাস ছয় হোল ।

এসব কারণেই গণশা আর পটলার মনে ভীষণ দুঃখ । ওরা ভাবে এখন কি করবে তারা ।

একটা ফিট ফাট বাবু লাট ছেলে একটু দূরে দাঁড়িয়ে গণশা আর পটলার দুঃখের কাহিনী শুনছিল । ওর নাম আকাশবাবু । গণশা পটলাকে চুপ করে থাকতে দেখে এসে বলল এই তোদের ঘুম হয় না তা তোরা টিভি দেখিস না কেন । কেবল্ টিভি-তে Adventure, National Geography. Comics কত কিছুই তো হয় । সবই দারুণ । এসব দেখবি তা হলেই খুব ভাল ঘুম হবে। আর রাতে কত স্বপ্ন দেখতে পাবি । ওঃ দারুণ । কি মজা ।

গণশা আর পটলার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ।

হায়রে কে কাকে কি উপদেশই দিচ্ছে ।

ওরা যে হা ঘরে শত দরিদ্র পারিবারে জন্ম নিয়েছে । ওদের ঘরে বিজলী নেই, টিভি থাকবে কোথা থেকে।

গণশা আর পটলাকে চুপ করে থাকতে দেখে বড়লোকের বেটা আকাশ-বাবু বলল ধ্যুৎ, তোদের কিস্‌সু হবে না । বলে কেটে পড়ল ।

একটু দূরে ঘাসের ওপর যাট উর্দ্ধ এক ভদ্রলোকও গণশা আর পটলার কথা শুনছিলেন । আকাশ চলে যেতে ভদ্রলোক একটু সরে এসে গণশা

আর পটলার কাছে বসলেন ।

ভদ্রলোক বললেন আমার নাম শম্ভু পণ্ডিত।

তোমাদের দুঃখের কথা সব আমি শুনেছি । তা তোমরা থাকো কোথা ?

গণেশ আর পটলা মুখ তাকাতাকি করতে লাগল ।

কোথায় থাকে বলল না ।

শম্ভু পণ্ডিত বললেন তোমাদের নাম কি ?

পটলা বলল আমি পটল বোস ।

গণশা বলল -- আমি গণেশ ঘোষ ।

শম্ভু পণ্ডিত প্রশ্ন করলেন -- তা তোমরা গল্প শুনতে খুব ভালবাস, কি তাই না ?

সমস্বরে গণশা আর পটলা বলল -- হ্যাঁ ।

শম্ভু পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞাসা করলেন -- আর কি সখ আছে তোমাদের ? ছবি আঁকতে পার ? রং, তুলি দিলে ছবি আঁকতে পারবে ?

দু'জনেই বলল নাঃ, ওসব আমরা পারি না । আর কোথায়-ই বা পাব রং, তুলি, কাগজ । আমরা যে গরীব ।

শম্ভুবাবু বললেন তোমরা একটা কাজ কর । আমার একটা মানুষ গড়ার কারখানা আছে -- কাছেই । তোমরা আমার সঙ্গে চলে এসো সেখানে। কোন কষ্ট হবে না । দেখবে সেখানে তোমাদের মত কত কচিকাঁচা ছেলে মেয়ে, বুড়োবুড়ি আমার কারখানায় কি খুশীতে কত কি করছে । পড়াশোনা করছে, গল্প লিখছে, কবিতা লিখছে, ছবি আঁকছে, সেলাই ফোঁড়াই করছে, গান করছে কত কিছু ।

গণশা আর পটলার চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায় । বলে -- সত্যি বলছেন স্যার । আপনার এ রকম একটা কারখানা আছে ?

শম্ভু পণ্ডিত বললেন সত্যি বলছি না তো মিথ্যে বলছি তোমাদের । এসেই দেখ না ওখানে । খুব ভাল লাগবে । কিন্তু তোমরা কোথায় থাক এখনও আমায় বলোনি ।

গণশা আর পটলা আবার এ ওর মুখ তাকাতাকি করল । কি যে করবে, বলবে, কি বলবে না বুঝে উঠতে পারছে না । আসলে ওরা যে বাড়ী

থেকে পালিয়ে এসেছে আর ঘরে ফিরবে না এ কথাটা বলতে পারছে না ।

শম্ভু পণ্ডিতমশাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন তোমরা যে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছ বুঝতেই পারছি ।

এরপরই পটলা হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল ।

পটলার দেখাদেখি গণশাও কাঁদতে লাগল ।

এ তো মহা মুস্কিলে পড়া গেল দেখছি । শম্ভু পণ্ডিত বললেন ।

যাই হোক অনেক করে ওদের দু'জনকে ঠাণ্ডা করে শম্ভু পণ্ডিত বললেন বেশ তো ঘরে ফিরতে না চাস তো চল আমার সঙ্গে । আমার কারখানায়। তোদের মত মা-বাপ হারা ঘর পালানো ছেলেপুলে নিয়েই তো আমার সংসার। ভয় নেই তোদের অন্য কোথাও বিক্রীও করে দেব না চাইলে তোদের বাড়ীতেও পৌঁছে দিতে পারি ।

ব্যাস আর যায় কোথা ।

পটলা আর গণশা কান্না থামিয়ে ভাঙ্গা গলায় চোখ কচলাতে কচলাতে বলল না স্যার আমরা আর বাড়ী যাব না । গেলে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে ।

বেশ তো । তোদের বাড়ী যেতে হবে না । নে এবার চল আমার সঙ্গে।

পটলা আর গণশা উঠে দাঁড়িয়ে শম্ভু পণ্ডিতের পায়ে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করে বসল । অর্থাৎ ওরা দু'জনেই নিজেদেরকে শম্ভু পণ্ডিতমশাইয়ের হাতে সঁপে দিল ।

কপাল ভাল পটলা আর গণশার ।

না চাইতেই জল, না চাইতেই তোফা আশ্রয় জুটে গেল ওদের কপালে।

এরপর আর কি।

শম্ভু পণ্ডিত গণশা আর পটলাকে সেই গঙ্গার ঘাট থেকে তুলে রিক্সা করে এনে হাজির করলেন নিজের আস্তানায় ।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সারা হলে পর শম্ভু পণ্ডিতমশাই গণশা আর পটলাকে একটা বিছানা করে শুইয়ে দিয়ে কতক্ষণ ধরে ওদের গল্প শোনালেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন ।

গণশা ও পটলা ঘুমিয়ে পড়ল ।

বাত-ভোর ওরা নানান ধরনের কত বিচিত্র স্বপ্নই না দেখল । দেখল একটা বিরাট কারখানা । সেখানে কত ছেলে-মেয়ে, কত জোয়ান, কত বুড়ো-বুড়ি, কত রকমের কাজই না করছে । ছেলে-মেয়েগুলো নাচছে, গাইছে, লিখছে, পড়ছে, ছবি আঁকছে, মাছ ধরছে, কত কিছু করছে ।

পরের দিন শম্ভু পণ্ডিতমশাই গণশা আর পটলাকে নিয়ে গেলেন তাঁর স্বপ্নে গড়া সেই স্কুলে ।

সামনের গেটে একটা বড় সাইনবোর্ড। তাতে লেখা আছে শম্ভু পণ্ডিতের মানুষগড়ার কারখানা (স্কুল) ।

গণশা পটলা স্কুলে পড়ত। একটু দাঁড়িয়ে সাইনবোর্ডটা পড়ল । তারপর পণ্ডিতমশাইয়ের সাথে ভেতরে ঢুকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাগজ রং তুলি নিয়ে কত ছবি আঁকছে ।

পণ্ডিতমশাই বললেন দেখ ওরা কিভাবে ছবি আঁকছে ।

শম্ভু পণ্ডিতমশাই আবার বললেন -- ওই দেখ আর এক দল ছেলে-মেয়ে । ওরা কিন্তু গল্প কবিতা লেখার চেষ্টা করছে । ওদের সামনে ওই যে দেখছ এক রাশ কালো সড়সড়ে পিঁপড়ে লাইন ধরে চলেছে । পিঁপড়েগুলোর মুখে সাদা সাদা পিঁপড়ের ডিম । ওরা ভেবেছে হঠাৎ বুঝি বৃষ্টি এসে পড়বে। আর তাহলেই ওদের ঘরদোর থাকার গর্ত সব নষ্ট হয়ে যাবে । সঙ্গে সঙ্গে ওদের ডিমগুলোও জলে ভেসে যাবে । আর তারই ভয়ে ওরা নিজেদের ডিমগুলোকে সরিয়ে নিরাপদ জায়গায় রাখার কাজে ব্যস্ত ।

ওই যে দেখছ নীল পাড়ের শাড়ি পরে ভদ্রমহিলা উনি রেখা দিদিমনি । উনি ছেলে মেয়েদের ওই পিঁপড়ের সারি দেখিয়ে যে যা পারে গল্প বা কবিতা লিখতে বলেছেন । ওরা চেষ্টা করছে ।

-- এখানে একটা নিয়ম আছে । যে লেখায় ফার্ষ্ট হবে তাকে দু'টো করে হরলিক্স বিস্কুট আর দু'টো করে ক্যাডবেরি চকোলেট দেওয়া হবে । বাকি যারা লিখতে চেষ্টা করছে তেমন পারেনি তাদের প্রত্যেককে একটা করে বিস্কুট আর একটা করে টফি দেওয়া হয় । -- কি ভাল লাগছে তো তোমাদের ?

গণশা আর পটলা সমস্বরে বলল -- খুব ভাল পণ্ডিতমশাই । আমরা

আর বাড়ী যাব না স্যার এখানেই থাকব । থাকতে দেবেন তো ?

শম্ভু পণ্ডিত বললেন । —নিশ্চয়ই । পটলা জিজ্ঞাসা করল স্যার ওই যে ছেলেগুলো ওখানে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে -- পড়ছে না । তবে কি শুধুই খেলা করছে ?

শম্ভু পণ্ডিত বললেন -- না, না খেলবে কেন । ওরা ওখানে অঙ্ক শিখছে । ছেলেগুলো নিজেরাই ঘুড়িগুলো বানিয়েছে । তবে ওরা অঙ্কে বড় কাঁচা । তাই ওদের মাষ্টারমশাই ওদেরকে একগাদা ঘুড়ি দিয়ে ওড়াতে দিয়েছে। কার ক'টা ঘুড়ি ছিল ক'টা ভো-কাট্টা হয়েছে এসব হিসেব করে বলতে হবে খেলা শেষে । মানে মাষ্টারমশাই ওদেরকে দিয়ে যোগ বিয়োগ অঙ্ক শেখাচ্ছে। বুঝেছ ।

পটলা আর গণশা বলল দারুণ । কি মজা ।

শম্ভু পণ্ডিতমশাই এর পর গণশা আর পটলাকে সমস্ত কারখানাটা ঘুরিয়ে দেখালেন ।

কোথায় রান্না হচ্ছে । কোথায় তাঁতে গামছা, শাড়ী বোনা হচ্ছে । কোথায় ছেলেরা কোদাল দিয়ে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে গাছপালা বসাচ্ছে, বেড়া দিচ্ছে। কোথায় পুকুরে কত ছেলে সাঁতার শিখছে এ সবই দেখালেন ।

এসব ছাড়া রীতিমত পড়ার স্কুলটাও দেখিয়ে দিলেন ।

সন্ধ্যার পর শম্ভু পণ্ডিতমশাই গণশা ও পটলাকে নিয়ে ওপাশের বুড়ি মণিমাসীর কাছে এদেরকে দিয়ে এলেন । বললেন মাসী গণশা আর পটলা রইল । এদেরকে দেখো ।

মণিমাসী গণশা আর পটলাকে জিজ্ঞাসা করলেন খাওয়া হয়েছে কি না?

গণশা ও পটলা বলল হয়েছে ।

মণিমাসী বললেন তবে আয় বিছানা করে দিই শুয়ে পড় ।

মণিমাসী বিছানা পেতে দেবার পর গণশা আর পটলা শুয়ে পড়ল ।

মণিমাসী ওদের মাথার শিয়রে বসে ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন । বললেন কি রে গল্প শুনবি তো এবার ?

গণশা পটলা সমস্বরে বলল হ্যাঁ মাসীমা । মণিমাসী ওদের মাথায় হাত

বুলিয়ে দিতে দিতে রাজা রাণীর গল্প বললেন ।

গণশা আর পটলা ঘুমিয়ে পড়ল ।

এভাবে মণিমাসী রোজই রাতে গণশা আর পটলাকে কত না গল্প শোনাল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাযুদ্ধের গল্প, গান্ধী মহারাজের অহিংসার গল্প । নেতাজী সুভাষের অন্তর্ধানের গল্প, বিশ্বকবি রবি ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার গল্প, সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর অপু দুগ্গার গল্প কত কিছু ।

এরপর বছরের পর বছর কাটতে লাগল ।

শম্ভু পণ্ডিতমশাইয়ের মানুষগড়ার কারখানায় থেকে গণশা আর পটলা বড় হয়ে উঠল । লেখাপড়া কাজকর্ম শিখে মানুষ হয়ে উঠল ।

এখন গণশা আর পটলা বড় হয়েছে । ওরা এখন শম্ভু পণ্ডিতমশাইয়ের মানুষগড়ার কারখানাতেই কাজ পেয়েছে । নতুন নতুন কচি-কাঁচাদেরকে ওরা এখন কত গল্পই না শোনায় । গল্প শুনতে শুনতে ছেলেগুলো ঘুমিয়ে পড়ে।

অতঃপর গণশা পটলার গপ্পোটি ফুরোল ।

সবুজ বন - হলুদ ধন

রোহিত।

অজ পাড়া গাঁয়ের এক গেঁয়ো ছেলে।

ছোট্ট একচিলতে খড়ের ছাউনী দেওয়া মাটির ঘরে থাকে।

মাত্র একখানা ঘর। আর এত্তোটুকু একটা রান্নাঘর।

সামনে এক টুকরো উঠোন।

উঠোনে আছে একটা তুলসী মঞ্চ।

রোহিতের মা রান্নাঘরের কাজকর্ম সেরে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা বেলায় ওই তুলসীতলায় এসে প্রদীপ জ্বালিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে।

রোহিতদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে মাঠের পর মাঠ ধানক্ষেত। উত্তরদিকে একটা মজা নদী। কচুরীপানায় ভর্ত্তি। বর্ষার সময় ফি বছর ওই কচুরিপানায় বেগুনী ফুল ফোটে।

বাড়ীর পূব দিকে ছেলেদের একটা খেলার মাঠ। মাঠ পেরলেই দু একটা ইট কোঠার বাড়ী। একটা স্কুলও আছে ওদিকে।

পশ্চিম দিকটায় রয়েছে একটা জঙ্গল।

জঙ্গলে আছে কত রকমের গাছগাছালি। আম, জাম, তেঁতুল খেঁজুর গাছও যেমন আছে, শাল গাছ, মহুয়া গাছও আছে প্রচুর। জঙ্গলের শেষ দিকটায় বিশাল বড় একটা বাঁশ বন। রাতে বাঁশ বনে শিয়াল ডাকে।

একটা শিয়াল যেই ডাকে হুক্কাহুয়া, অমনি বনের অপর প্রান্ত থেকে অন্য শিয়ালেরা সাড়া দেয় হুক্কাহুয়া। কেয়া হুয়া বলে।

রোহিত ছেলেবেলা থেকেই একটু ঠাকুর দেবতাভক্ত। ঠাকুর বলতে তো দুর্গা ঠাকুর আর কালী ঠাকুরকেই রোহিত জানে। কারণ আশ্বিন মাসে গ্রামের পুরোন জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরীর বাড়ীতে এখনও বিরাট করে দুর্গা পূজো হয়। পূজোর ক'টা দিনই রোহিত দুবেলাই ঠাকুর দেখতে

যেত। কারণ অবশ্য একটা আছে ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া আর ঢাকের বাদ্যি শোনা।

জষ্ঠিমাসে বোস পাড়ার বারোয়ারী তলায় প্রতি বছর রক্ষাকালী পূজো হোত। সন্ধ্যা থেকে সেই ভোর রাত পর্য্যন্ত পূজো, হোম আরতি কত কি। মাঝরাতের পূজোটা হয়ে গেলেই পাঁঠাবলি হোত। কত ভক্ত মানত করা জোড়া পাঁঠা নিয়ে আসত বলির জন্য। বলির সেই বড় খাঁড়াটা পাঁঠার গলায় যেই কোপ বসাত দু'খানা ঢাক সশব্দে বেজে উঠত।

একটু পরেই আরম্ভ হোত হাঁড়িকাঠের পাশ দিয়ে স্রোতের মত রক্ত বয়ে যাওয়া।

পাঁঠাবলির এই রক্ত দেখে আর ঢাকের ওই বাদ্যি শুনে রোহিতের মূর্হুঃমূহু হৃদস্পন্দন হোত। রোহিতের বড় কষ্ট হোত।

রোহিত ভাবত আহারে ওই কচিকাঁচা পাঁঠাগুলোকে ধরে নিয়ে এসে লোকেরা যে কেন বলি দেওয়া করায় কে জানে।

রোহিত দেখত বলির পরই কাটা মুণ্ডহীন পাঁঠাগুলোকে পিঠে ফেলে লোকগুলো ফিরে যেত। ঘরে গিয়ে ওই পাঁঠার মাংস দিয়ে হয়ত ওদের মহাভোজ হোত।

সত্যি কি নিষ্ঠুর ওরা।

রোহিতের বড় কষ্ট হয়।

যাই হোক রাত ভোর পূজো দেখে প্রসাদ নিয়ে ভোগ খেয়ে মা রক্ষাকালীকে প্রণাম করে রোহিত ভোরে বাড়ী ফিরে এসে টেনে এক ঘুম লাগাত।

দুপুরে রোহিতের মা ডেকে দিত - রোহিত ওঠ। যা নদীতে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আয়। ভাত হয়ে গেছে। খেয়ে নিয়ে তোর বাবার জন্য ভাতটা মাঠে দিয়ে আয়। নে নে ওঠ বেলা পড়ে এল।

রোহিত উঠে পড়ত মায়ের ডাকে। স্নান সেরে নদীর পাড়ে বসে রোহিত কাদামাটি দিয়ে কালীঠাকুর বানাতে চেষ্টা করত। কিন্তু পারত

না। ওর মনে কষ্ট হোত। তবুও ওর চেষ্টার খামতি থাকত না।

রোহিত ঠাকুর গড়তে না পারুক মনে মনে ঠাকুরকে ডাকা, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা এ সবই ছিল রোহিতের নিত্যকর্ম।

মাটির ঠাকুর বুঝি রোহিতের সব কথাই শুনত।

রোহিত বলত ঠাকুর তুমি তো মাটি। তোমার মাটিতে কোন রঙ নেই। নিঙড়লেও কোন রং বার হয় না। কিন্তু মাঠে ঘাটে ওই কচি কাঁচা ঘাসে অত সবুজ রং এল কোথা থেকে। গাছপালাগুলোর পাতাতেই বা অত সবুজ রং এলো কোথা থেকে।

আমি সবুজ রং ভালবাসি। হলুদ রঙও ভালবাসি। ওই রং দিয়ে ছবি আঁকতে চাই। কিন্তু আমি তো গরীব। রং তুলি পাব কোথায়। লেখা পড়াও শিখিনি। তুমি বলে দাও ঠাকুর গাছের ওই পাতাগুলো নিঙড়লে কি আমি সবুজ রং পাব?

রোহিতের মাটির ঠাকুর একদিন রূপ ধারণ করে রোহিতকে এসে দর্শন দিল।

ঠাকুর বলল আমি মাটি। আমিই সকলের মা। তোর পূজোয় আমি সন্তুষ্ট। তোকে বর দিতে এসেছি। তুই কি বর চাস্ বল।

রোহিত অবাক হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে ঘোর কাটলে বলে - মা সত্যিই তুমি মাটি। তুমি সকলের মা?

মা বলে হ্যাঁরে। আমিই মাটি আমিই মা। এবার বল তোর কি চাই।

রোহিত বলে আমি কিছু চাই না। শুধু জানতে চাই ওই ধান ক্ষেত ওই মাঠের ঘাস, গাছপালা ওরা অত সবুজ রং পায় কোথা থেকে? আমি তো মাটি নিঙড়েও একটু রং বার করতে পারি না।

মা উত্তর দিল - ওটাও আর এক মায়ের কাণ্ড কারখানা। ওই মাটির নাম প্রকৃতি মা। প্রকৃতি মা-ই এই সব গাছ পালায় বন জঙ্গলের পাতায় পাতায় সবুজ ঘাসে রঙ দিয়ে যায়। আসলে প্রকৃতি মা-ই হোল

সবুজ মা। ওনার দয়াতেই জীবজন্তু পশুপক্ষী সব বেঁচে আছে। প্রকৃতি মাকেও পূজো করবি এবার থেকে। মা সন্তুষ্ট হলে একদিন এসে তোকে বর দিয়ে যাবে।

রোহিত বলে — সত্যি?

মাটি বলে হ্যাঁরে সত্যি। - যাই হোক এখন আমার কাছে কি চাস বল।

রোহিত বলে কি আর চাইব। আমরা খেতে পাইনা। ভীষণ গরীব। তুমি যদি কিছু দিতে চাও তবে এই বর দাও যাতে আমরা রোজ দুটি ডালভাত খেতে পাই।

মাটি বললেন তথাস্তু। নে ধর এই এক মুঠো চাল আর ডাল। তোর মাকে দিয়ে বলবি সযত্নে তুলে রাখতে। আর রোজ একমুঠো চাল আর ডাল নিয়ে মাকে রাঁধতে বলবি। এতেই তোদের সারা বছর হয়ে যাবে।

এরপরই মা-টি অদৃশ্য হয়ে যায়।

রোহিত চাল ডাল নিয়ে বাড়ী ফিরে এসে ওর মাকে সেগুলো দিয়ে কি করতে হবে বুঝিয়ে দেয়।

রোহিতের মা ছেলের কথা মত রোজ একমুঠো চাল আর একমুঠো ডাল নিয়ে হাঁড়ি ভর্ত্তি গরম জলে ছেড়ে দেয়। তৈরী হয়ে যায় হাঁড়ি ভর্ত্তি খিচুড়ি। তারপর রোজ সন্ধ্যের সময় ওরা তিনজনে বসে খিচুড়িভোগ খায় সানন্দে।

একবছর ঠিক এমনি ভাবেই চলল রোহিতদের।

ভাঁড়ারের চাল আর ফুরোয় না।

মাটির বর দেওয়া চাল ডালতো তাই অফুরন্ত।

এর পরও কিন্তু রোহিত নদীর ধারে গিয়ে নির্জনে বসে সবুজ মাকে ডাকে।

অনেক ডাকাডাকির পর একদিন সবুজ মা - প্রকৃতি মা এসে

রোহিতকে দর্শন দিল।

কি চাই রোহিত। কি বর চাস্ তুই আমার কাছে? আমি তোর পূজোয় সত্যি সন্তুষ্ট।

রোহিত বলে মা মাঠভর্ত্তি সবুজ আর হলুদ রঙ বানাতে চাই। আমার তো রং তুলি নেই। তুমি কি আমাকে সেই রঙ এনে দেবে?

সবুজ মা - প্রকৃতি মা বলে দেব। নে ধর এই এক মুঠো ধান। তোর বাবাকে দিয়ে বলবি মাঠে ভাল করে চাষ দিয়ে এগুলো যেন ছড়িয়ে দেয়। দেখবি সবুজ আর হলুদ রঙে মাঠভর্ত্তি হয়ে যাবে। তোদের আর দুঃখ কষ্ঠ থাকবে না।

— সত্যি। প্রকৃতি মা!

— হ্যাঁ সত্যি। নে ধর।

তারপর রোহিত সেই এক মুঠো ধান এনে তার বাবাকে দিয়ে কি করতে হবে বলে দিল।

রোহিতের বাবা প্রকৃতি মার কাছ থেকে পাওয়া সেই ধান গুলোকে চাষ করা জমিতে ভাল করে ছড়িয়ে দিল।

দু মাসের মধ্যেই মাঠভর্ত্তি ধান গাছে ভরেগেল। মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হলো। তর তর করে গাছগুলো বেড়ে উঠল। জোরে বাতাস বইলে সবুজ ধানগাছে ঢেউ খেলে যেতে লাগল। এর কিছুদিন পরেই সবুজ ধান গাছে হলুদের ছোঁয়া লাগল। আসলে ধান ফলে পেকে গেছে তাই হলুদ রঙ ধরেছে।

সবুজ আর হলুদের খেলা দেখে রোহিতের চোখ জুড়িয়ে যায়।

রোহিতের বাবা সেই বছরই মন মন ধান ঘরে তুলল। অত ধান রাখবে কোথা। জায়গা না পেয়ে বড় করে একটা মরাই বানাল উঠোনে।

তারপর ধান ঝেড়ে সেই হলুদ সোনা তুলে মরাই ভর্ত্তি করে রেখে দিল।

এরপর আর কি —।

রোহিতের বাবা সেই ধান বিক্রী করে ভাল রকমের আয় করল। পরের বছর আবারও সেই ধান বুনে আরও একটা মরাই ভরল। এমনি করেই বছরের পর বছর ধরে ওদের বাড়বাড়ন্ত হোল। মরাইয়ে মরাইয়ে উঠোন ভর্ত্তি হয়ে গেল।

রোহিত ইতিমধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ঠাকুরের আশীর্বাদে বাপ বেটায় মিলে একটা ধানের আড়ৎ বানিয়েছে। পাইকারি দরে এখন ওরা মন মন ধান বিক্রী করে।

একদিন রোহিতের মা বলল "হ্যাঁগো ঠাকুরের আশীর্বাদে যখন আমাদের এতটাই হলো এবার এসো না আমরা ভাল করে মা লক্ষ্মীর একটু পূজো করি। রথের মেলায়তো লক্ষ্মীর পট কিনতে পাওয়া যায়। একটা নিয়ে এসো না কিনে।"

রোহিতের বাবা একদিন কালীঘাটে এসেছিল কোলকাতায়। সেখান থেকে একটা লক্ষ্মীর পট আর একটা লক্ষ্মীর সরা কিনে আনল। একটা লাল পাড় শাড়ী কিনতেও ভোলেনি। তাছাড়া ফুল-ফল পূজোর সব উপকরণই এনে দিল রোহিতের মাকে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজোর দিনে ওরা তিনজনে মিলে মাটির ঘরে বসে মাটির পূজো করল আর সেই সঙ্গে প্রকৃতি মা ও মা লক্ষ্মীর। রাতও জাগল সবাই মিলে। রাতে যারা পূজো দেখতে এল রোহিতের মা সবাইকে উঠোনে কলাপাতা বিছিয়ে মায়ের ভোগ খাওয়াল পেট পুরে।

রোহিতের বাড়ীর আশ পাশ এখন চির সবুজ বনে ভর্ত্তি। আর মাঠে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু হলুদ সোনা ধানের ক্ষেত। সবুজ আর হলুদ রঙের ছড়াছড়ি।

সবুজ আর হলুদ রঙ দিয়ে রোহিতের প্রকৃতি মা যেন ছবি এঁকে রেখেছে। দেখে রোহিতের চোখ জুড়িয়ে যায়।

ফুলটুসি

'তোতা' মানে মহুয়া।

আমার আদরের ছোট ভাইঝি।

দর্শন নিয়ে এম. এ. পাশ করেছে। বি. এড. এর জন্য ফর্ম ফিলাপও করে বসে ছিল। গরমের ছুটি, তাই কলেজ বন্ধ।

তোতার বাবা মা তোতার বিয়ের জন্য কাগজে কত বিজ্ঞাপনই না দিয়ে চলেছে পাত্র চাই কালামে। কিন্তু মনের মত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সর্বগুণসম্পন্ন, সুপুরুষ রাজপুত্রের মত পাত্র আর কোথায় পাওয়া যাবে?

তোতার মনে বড় দুঃখ।

বেশী লেখাপড়া শিখলে নাকি ভাল পাত্র মেলা ভার হয়। সবাই ত তাই বলে। কি জানি এখন তোতার ভাগ্যে কি লেখা আছে।

সেদিন তোতা সন্ধ্যের ঝোঁকে ওদের বাগানবাড়ীতে হালকা চালে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গুনগুন করে গানও করছিল। ওর নীল ওড়নাটা বারবারই ফোটা ফুলের ডালে পাতায় নয়ত বা গোলাপ কাঁটায় আটকে যাচ্ছিল।

"আঃ বড় জ্বালাচ্ছে ত ওড়নাটা।"

তোতা বারবারই ওড়নাটাকে লতা পাতা, গোলাপ কাঁটা থেকে ছাড়িয়ে নেয়।

হঠাৎ দুটো কাক ঝটাপটি করতে করতে তোতার ঠিক সামনে এসে পড়ল। তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল দুটো কাকই। মারামারি করতে করতে একটা কাক একবার নীচে পড়ে আর অপরটা তখন অন্য কাকের বুকের ওপর চড়ে বসে ওটাকে ঠুকরে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা করে। পরক্ষণেই নীচের কাকটা উঠে পড়ে অন্য কাকটাকে নীচে ফেলে ঠোকরাতে থাকে।

কিন্তু কি নিয়ে এদের মধ্যে মারামারি তোতার বুঝতে একটু দেরী হয়।

একটু পরেই একটা কাক পরাজিত হয়ে উড়ে পালায়। বিজয়ী কাকটা এবার উড়ে গিয়ে ওপাশে কসমস ফুলের ঝোপে পড়ে থাকা একটা হলুদ রঙের পাখীর পাশে গিয়ে বসে। তারপরই ঠোঁট দিয়ে ওটাকে ঠোকরাতে থাকে।

তোতার নজর পড়ে যায়।

'আরে এটা তো একটা বসন্ত গৌরি পাখি মনে হচ্ছে। আহারে বেচারা।'

তোতা ছুটে গিয়ে কাকটাকে তাড়িয়ে দেয়।

তারপর ফুলবাগান থেকে বসন্ত গৌরি পাখিটাকে কোলে তুলে নেয়।

'ও মা একি! এ যে দেখি পাখিটার ডান দিকের একটা ডানাই নেই।'

পাখির ডানাটা দিয়ে তখনও টিপ টিপ করে রক্ত ঝরে পড়ছিল।

তোতা তার সাধের নীল ওড়নাটা দিয়ে বসন্ত গৌরির ডানাটা চেপে ধরল। তারপর ছুটে গিয়ে ওদিককার গাঁদা গাছের চারটি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বেশ করে থেঁতো কর ক'ফোঁটা রসও দিল পাখিটার কাটা ডানাটার ওপর।

বসন্ত গৌরির ডানা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হতেই ওর মুখ দিয়ে একটা শব্দ বার হোল—'চিক্'।

তোতা আদর করে ওর ঠোঁট দুটোকে ধরে ওর নিজের মুখে মুখ ঠেকিয়ে আদর করে বলল—''আহারে সোনামণি আমার। বলি তোর এমন দশা কে করল বলত? কাকে ত আর ডানা কেটে দিতে পারে না।''

হলুদ পাখি বসন্ত গৌরি বলে—'চিক্'।

তোতা এবার পাখিটাকে কোলে করে নিয়ে ছুটে গেল বাড়ীতে। চেঁচিয়ে বাড়ী মাত করল।

'ও মা দেখ, দেখ, কি সুন্দর একটা পাখি ধরেছি।'

সবাই ছুটে এল।

'কই দেখি দেখি।'

কেউ বলল ওটা বাচ্চা মাছ রাঙ্গা পাখী, কেউ বলল বেনেবউ, আবার কেউ বলল বসন্ত গৌরিই হবে।

তোতা বলে উঠল—'না না ওটা আমার ফুলটুসি।'

'দেখবে ও আমার ডাকে কেমন সাড়া দেয়।'

তোতা ডাকে ফুলটুসি, ফুলটুসি।

পাখিটা বলে—'চিক্, চিক্।'

তোতা বলে, 'দেখলে ত।' 'কিন্তু ওর ডানাটা কে কেটে দিল বলত। একি নৃশংস কাণ্ড! কাকে ত আর ডানাটা ছিঁড়ে বাদ দিয়ে দিতে পারে না। এ নিশ্চয়ই ওই সব মুরগী কাটা কসাই দলের কাণ্ড কারখানা।'

তোতার বাবা ইতিমধ্যে বাইরে থেকে খবর নিয়ে এসেছে। ও পাড়ার বিটলে ছেলে হেঁদো আর ভেঁদোর কাণ্ড এটা। কাকে পাখিটাকে তাড়া করেছিল। ও ভাল করে উড়তেই শেখেনি। তারপর যেই পড়ে গেছে হেঁদো আর ভেঁদো ওকে উঠিয়ে নিয়ে নিছকই খেয়ালখুশিতে কাঁচি দিয়ে একটা ডানা ছেঁটে দিয়েছে। যাতে করে আর না উড়তে পারে।

এরপর দুটো কাক এসে হেঁদো ভেঁদোর হাত থেকে পাখিটাকে ছিনিয়ে নেয়। হেঁদো ভেঁদো তাই আমাদের বাগানে এসেছিল পাখিটাকে খুঁজতে।

জিজ্ঞাসা করতে হেঁদো বলল আমাদের একটা হলুদ রঙের পাখিকে কাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। পাখিটাকে খুঁজছি।

তোতার বাবা ভেঁদোকে জিজ্ঞাসা করে তোর হাতে ওটা কি?

ভেঁদো বলে, 'কই কিছু না ত।'

ততক্ষণে ভেঁদো পাখির ডানাটাকে ফুলগাছের ঝোপে ফেলে দিয়েছে।

তোতার বাবা ডানাটা দেখতে পেয়ে বলল ওটা ত হলুদ পাখিটারই একটা ডানা। তবে রে হারামজাদা। এক চড়ে আজ তোদের দুটোকেই

শেষ করব। ওইটুকু পাখীটার ডানাটাকে কেটে ফেলতে তোদের একটু কষ্ট হোল না রে। তোর এই হাতটা যদি আমি একটা ছাগল কাটা চপারে করে কেটে দিই তখন তোর কি হবে বলত। মজা পেয়েছিস তোরা খুব তাই না। বেরো বলছি হারামজাদার দল। বেরো বাগান থেকে।'

এসব শুনে তোতার চোখে জল এল।

'আহারে তাহলে ফুলটুসির কি হবে। আর কি ওর নতুন ডানা গজাবে। না কি ও কোনদিন উড়তে পারবে।'

তোতা ডাকে—'ফুলটুসি'।

হলুদ পাখি ফুলটুসি উত্তর দেয়—'চিক্'।

তোর খুব ক্ষিদে পেয়েছে তাই নারে? দাঁড়া তোর জন্য দুধ আর ছাতু নিয়ে আসি।

তোতার দিদি মিঠু এসে তোতাকে সাহায্য করে। ওরা ফুলটুসিকে ধরে ওর ঠোঁটটা ফাঁক করে প্রথমে একটু জল দেয়। তারপর দুধ আর ছাতু গুলে খাইয়ে দেয়। সব শেষে আবারও জল দেয়।

এখন সমস্যা ফুলটুসিকে রাতে কোথায় রাখা যায়। বাড়ীতে একটা বেড়ালও আছে। যাইহোক ফুলটুসির পায়ে একটা সুতলি দড়ি বেঁধে ওকে একটা পাখীর দাঁড়ে রেখে দিল তোতা।

ফুলটুসি আরাম বোধ করল।

কিছুক্ষণ পরেই পাখিটা তার ছোট্ট ঠোঁটটাকে বাঁ পাশের ডানার মধ্যে গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতে খেয়ে দেয়ে তোতা শুতে গেল।

যাবার আগে ফুলটুসিকে একবার দেখে গেল ও ঘুমোচ্ছে কিনা। দেখল ফুলটুসি সত্যিই ঘুমোচ্ছে।

তোতাও গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ওর মাথার মধ্যে তখন কিন্তু শুধুই ফুলটুসির চিন্তা।

ফুলটুসির কি হবে। ওর কাটা ডানাটা যদি আর না গজায় তবে ও উড়বে কেমন করে। পরক্ষণেই ফুলটুসিকে একবার ফুলবাগানে উড়ে গিয়ে বসতে দেখে। ফুলটুসি একবার টগর গাছে বসছে। একবার করবী

গাছে বসছে। একবার জামরুল গাছের ডালে বসছে। তারপরই আবার উড়ে গিয়ে বাড়ীর উঠোনে কচি পেঁপে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে বসছে।

তোতা ডাকে 'ফুলটুসি'।

ফুলটুসি উত্তর দেয় 'চিক্'।

ফুলটুসি এরপর বলে 'তোতা আমি কে জানিস। আমি সত্যিকার এক ফুলপরী। সাধ হয়েছিল বসন্ত গৌরি হতে। হয়েও ছিলাম। কিন্তু যেই না বসন্ত গৌরি হয়েছি ওই জল্লাদ ছেলে দুটো কোথা থেকে এসে আমায় ধরে আমার ডানা ছেঁটে দিল। আমার পরীর ডানাটা খসে পড়ল ওই বাগানে। পরীর হাতে ধরা তারা খচিত সেই যাদু দণ্ডটাও পড়ে গেল। কি করে যে আবার ওটাকে পাব জানি না। ওটাকে পেলেই আমি আমার পরীর ডানাটা জুড়ে নিতে পারব।'

ভোর হলো।

সূর্য্য উঠল।

তোতা ঘুম থেকে উঠেই ছুটে গেল ফুলটুসির কাছে।

তোতা ডাকল—'ফুলটুসি'।

ফুলটুসি সাড়া দিল—'চিক্'।

তোতা ওকে দাঁড় থেকে নামিয়ে দড়ি শুদ্ধ ধরে আস্তে করে নিয়ে গিয়ে কচি পেঁপে গাছের পাতার ঝোপে বসিয়ে দিল। দড়ির অপর খুঁটটা গাছের ডালে বেঁধে দিল। কাল রাতে স্বপ্নে তোতা পাখিটাকে পেঁপে গাছে আরামে বসে থাকতে দেখেছিল।

একটু পরে সবাই উঠে ফুলটুসিকে দেখতে এলো।

দুধ আর ছাতু খেতে দিল।

তোতার কিন্তু রাতে ঘুম হয়নি। ও সকালে উঠেই ফুলটুসির শুশ্রূষা করল। ওর ডানার খোঁজে বাগানে গিয়ে কত খোঁজাখুঁজি করল।

হঠাৎ কসমস-এর ঝোঁপে ফুলটুসির কাটা ডানাটা দেখতে পেল তোতা। তোতা ডানাটা তুলে নিয়ে গিয়ে ফুলটুসির গায়ে একবার ছোঁয়াল।

আর যায় কোথা।

ফুলটুসির গায়ে যেন জোর ফিরে এল। সে ঠোঁট দিয়ে সুঁতলি দড়িটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলল মুহুর্তে। তারপরই ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে ওদিককার টালির চালে গিয়ে বসল।

তোতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

কত করে ডাকল ফুলটুসি ফিরে আয়। ফিরে আয় বলছি। পড়ে যাবি ওখান থেকে। বেড়াল ধরবে তোকে।

কিন্তু ফুলটুসি আর ফেরে না। একটু পরেই সে দিব্যি কোথায় উড়ে চলে যায়।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

তোতা হঠাৎই দেখে ফুলটুসি ফিরে এসে সেই পেঁপে গাছের পাতার ফাঁকে বসেছে।

তোতা গিয়ে ডাকে—'ফুলটুসি'।

ফুলটুসি সাড়া দেয় 'চিক্'।

তোতা হাত বাড়াতেই ফুলটুসি তার মাথাটা নিচু করে ঠোঁটে ধরা এক টুকরো কাগজ তুলে দিল তোতার হাতে।

—'কি রে এটা। এটা দিয়ে কি হবে আমার?' তোতা বলে।

তোতা আবার বলে 'কি রে আর যাবি না ত? এই গাছে বসে থাকবি ত? ভয় নেই, আমি আর তোকে বাঁধব না।'

সেই রাতে তোতা ঘুমিয়ে আবার স্বপ্ন দেখে। ফুলটুসি বলছে— 'তোতা তোর শুশ্রূষায় আমি সেরে উঠেছি। আমি সত্যি একজন ফুলপরী। আকাশে মেঘের মধ্যে ঘুরে ফিরে খেলা করে বেড়াই। তোকে বর দিতে এসেছিলাম। দিয়েও গেলাম। তোর বর হবে রাজপুত্তুরের মত সুন্দর দেখতে। তোকে খুব আদর করবে ভালবাসবে। তোর সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে দেবে তোর বর। বরের রাজপ্রাসাদের মত বাড়ী আছে, গাড়ী আছে, আর আছে কালার টিভি।

পরের দিন তোতা উঠে দেখে পেঁপে গাছে ফুলটুসি বসে নেই। পড়ে আছে শুধু সেই খবরের কাগজের চিরকুটটা।

তোতা কাগজের টুকরোটা ফেলে দিতে গিয়েও না ফেলে একবার

পড়ে দেখল। দেখল একটা পাত্রী চাই-এর বিজ্ঞাপন রয়েছে চিরকুটটায়।

তোতার বাবা মা ওই কাগজটা নিয়ে বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে খুঁজে পেল তোতার বরকে।

সে একজন নাম করা ডাক্তার।

পরে ছেলের বাবা ও ছেলে এসে দেখে গেল মেয়েকে।

ছেলের মেয়ে পছন্দ হয়েছে।

মেয়েরও ছেলে পছন্দ হয়েছে। এরপর আর কি।

তোতা রাণীর বিয়ে হয়ে গেল ধুমধড়াক্কা করে।

ফুলশয্যার রাত পোয়াতে তোতা শুনতে পেল ফুলটুসির সেই ডাক—'চিক্'।

ফুলশয্যার বিছানা ছেড়ে তোতা উঠে বলে 'কোথায় রে আমার সোনামণি ফুলটুসি—'

ফুলটুসি খোলা জানলার গ্রিলে বসে সাড়া দেয়---'চিক্'।

তোতা ছুটে যায়।

ফুলটুসি মুখে করে একটা অপরাজিতা ফুল এনেছিল। তোতা হাত বাড়াতেই ফুলটুসি সে ফুলটা তোতার হাতে দিয়ে বলল — 'চিক্'।

ফুলটুসি এরপরই সেই যে উড়ে গেল আর ফিরল না।

ফুলটুসির গপ্পোটি ফুরোলো।

"বন্দেমাতরম্"

(নব পরিকল্পিত দুর্গাপূজার এক অভিনব প্রয়াস)

বর্ষা শেষে শরৎ আসে।

শরৎ আসে তার প্রমাণ সকালে ঘাসের পাতায় শিশির বিন্দু ভোরের আলোয় নক্ষত্রের মত চিক্ চিক্ করে। কুমারী সব ছোট ছোট মেয়েগুলো সকাল বেলায় শিউলী তলায় এসে জড়ো হয় ফুল কুড়োতে। কেউ শিউলী কুড়িয়ে কোঁচড়ে রাখে কেউ বা ফুল রাখে ফুলের চুপড়ীতে। শিউলী ফুলের মালা গাঁথতে হবে যে। মা আসছেন। সপ্তমী অষ্টমীতে মায়ের গলায় শিউলীর মালা না দিলে কি দুর্গাপূজা মানায়।

এসব ছাড়া প্রকৃতির স্নিগ্ধ সকালে আকাশে থাকে সাদা মেঘের ছড়াছড়ি, আরও কাশের বনে প্রস্ফুটিত দোদুল্যমান কাশ ফুল। পথে প্রান্তরে, রেললাইনের দুপাশেই দেখতে পাওয়া যায় শরৎকালীন স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল কাশফুলের রাশি।

মা আসেন।

আনন্দময়ী মা দুর্গা আসেন প্রতি বছর এই শরৎকালে বাঙালীর ঘরে। সেই অনন্তকাল থেকে। মহিষাসুর নিধন হওয়ার কাল থেকেই মা এসেছেন সপরিবারে সবাহনে।

সেই সুদূর হিমালয় পর্বতে শিবের আশ্রয় থেকে মা দুর্গা মাত্র পাঁচটি দিনের জন্য ছুটি নিয়ে মর্তে এসে বিশ্ববাসী তথা ভারতবাসীর পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন আর মর্তবাসী জনগণকে আশীর্বাদ করে যান, তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে যান। তাই ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী এই পাঁচ দিন ধরেই চলে মণ্ডপে মণ্ডপে মায়ের বিহিত পূজা পাঠ, চণ্ডীপাঠ। ব্রাহ্মণদের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ আর ভক্তবৃন্দের অঞ্জলি প্রদান।

দুর্গোৎসব তথা শারদোৎসব বাঙালীদের নিজস্ব উৎসব। সে কিবা বাংলা, কিবা বিহার, উড়িষ্যা, কিবা বাংলাদেশ বা লণ্ডন। যেখানেই জনা দশেক বাঙালী একত্রে বাস করছে সেখানেই দেখতে পাওয়া যাবে শারদোৎসব তথা দুর্গোৎসবের এই রমরমা।

দেশে যদিও মৃন্ময়ী মায়ের মূর্তি তৈরীর রেওয়াজ আছে তবে বিদেশে এই মৃন্ময়ী মূর্তি নিয়ে যাওয়া সহজসাধ্য নয় জেনে কেউ বা বাংলার প্রতিমা শিল্পীদের নিয়ে যান বিদেশের মাটিতে দুর্গা মূর্তি তৈরীর জন্য। কেউ বা শোলা বা থার্মোকলের প্রতিমা নিয়ে যান প্লেনে করে।

যাই হোক বাঙালীর এই উৎসবে শুধু বাঙালীই নয় বাঙালী-অবাঙালী বোধ করি হিন্দু মুসলমান সবাই মেতে ওঠেন এই পূজোকে কেন্দ্র করে। এটাই ভারতের বড় জাতীয় উৎসব।

পূজায় চাই নতুন জামা, নতুন কাপড়, নতুন জুতো। আর তারই আশাতে সারা বছর অপেক্ষায় থাকে প্রতি ঘরের প্রতিটি ছেলেমেয়ে, আবাল বৃদ্ধ বণিতা।

ছেলে মাকে শাড়ী দেয়। স্বামী স্ত্রীকে। বাবা ছেলে মেয়েকে জামা কাপড় কিনে দেয়। ষষ্ঠীর দিন এ সব নতুন জামা কাপড় পরাই একটা চলতি রীতি। পবিত্র মন, শুভ্র শুচি বসনেই তো মায়ের আরাধনা চলে। পূজো চলে।

সেই ষষ্ঠীর দিন থেকেই বাড়ীর সব ছেলে মেয়েরা বেরিয়ে পড়ে ঠাকুর দেখতে। ষষ্ঠীর দিন থেকে দেখলে তবেই তো ৪দিন ধরে নানান জায়গার নানান বৈচিত্র্যের প্রতিমা দেখতে পাওয়া যাবে।

বিজয়ার দিন তো আর বাড়ী থেকে বেরোন যায় না। বিজয়া সারতে আসবে কত বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী। মাকে শেষ প্রণাম জানিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন অন্তে চলবে ভাইয়ে ভাইয়ে, বন্ধুতে বন্ধুতে কোলাকুলি। ভ্রাতৃত্ব মৈত্রীর বন্ধন যাতে সারাটি বছর ধরে অক্ষুণ্ণ থাকে তারই প্রার্থনা।

একাদশীর দিন আসলেই মনে হয় ঠাকুর এলো আর চলে গেল। তখনও ঢাকের বাদ্যির সেই সুরটা যেন ঘুরে ফিরে বাজতে থাকে কানে "ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ। ঠাকুর যাবে বিসর্জন।" তাই বিজয়া আসার আগেই ষষ্ঠীর দিন থেকে প্রতি সন্ধ্যায় পূজো প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ভিড় উপচে পড়ে।

কোথায় কোন প্রতিমাটা ভাল হয়েছে, কোথায় কোন মণ্ডপটা

এবার এশিয়ান পেন্টের পুরস্কার পেয়েছে এ সব খুটিয়ে দেখাটা আবার আমার বাতিক। আরও বাতিক প্রতিমার ছবি তোলা আর মণ্ডপ সজ্জার বৈচিত্র্য ছবিতে ক্যামেরায় তুলে রাখা।

ঠিক প্রতি বছরের মত এবারও আমি কাঁধের ঝোলা ব্যাগে ক্যামেরাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুর্গোৎসবের বৈচিত্র্য সংগ্রহ করতে।

পূজোর প্রথম দিন শুক্রবার সকালে বেরিয়েছি দেখলাম একটি মণ্ডপ থেকে মাইকে ভেসে আসছে, চণ্ডীপাঠের মন্ত্রধ্বনি। একটু আগেই কারা যেন কলাবউ চান করিয়ে নিয়ে গেল ঢাক বাজাতে বাজাতে, দেবীর বোধন হবে।

বেলা তখন কত আর হবে। আটটা হবে! দ্বিতীয় মণ্ডপের দিকে এগোতেই মাইকে ভেসে এল কতকগুলি কথা। শুনতে পেলাম কে যেন বলছে সপ্তমী হারিয়ে গেছে। সপ্তমীকে পাওয়া যাচ্ছে না। অল্প সময়ের জন্য তাকে পূজা মণ্ডপে দেখা গিয়েছিল। যাই হোক আপনারা যারা অষ্টমীকে দেখতে চান, যারা অষ্টমীতে অঞ্জলি দিতে চান তাঁরা সকাল ৮টার মধ্যে পূজা মণ্ডপে চলে আসুন। অঞ্জলি দেওয়া শুরু হবে।

প্রথমে বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। পরে মণ্ডপের এক কর্ণধারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং বড় পোষ্টারে অঞ্জলির দিনক্ষণ দেখে বুঝতে পারলাম শুক্রবার আজই সপ্তমী ছিল সকাল ৮টা পর্যন্ত তারপর অষ্টমী পড়ে গেছে। সুতরাং অষ্টমীর বিহিত পূজা ও অঞ্জলি ৮ টাতেই প্রশস্ত। সুতরাং সপ্তমী হারানোর রসিকতা সূচক ঘোষণাটি এবার বোধগম্য হল।

মনে মনে হাসলাম ঘোষকের এই বৈচিত্র্যময় ঘোষণা শুনে।

কাজেই আমাদের কাছে পূজোর একটি দিন হারিয়ে গেল। কেউই ভাল করে সপ্তমীপূজো উপভোগ করতে পারলাম না।

যাই হোক এত গেল পাঁজির বিড়ম্বনা, পূজা নির্ঘণ্টের এক করুণ নিদর্শন যা সচরাচর চোখে পড়েনি—এবার পড়ল।

এরপর আর কি, যথারীতি কলকাতার প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ঘুরে ছবি তুলছি। মণ্ডপের ছবি তুলছি। প্রতিমা দেখছি, প্রতিমার সাজসজ্জা আলোর খেলা ও বৈচিত্র্য দেখে বেড়াচ্ছি। এই একটা দিনেই কলেজ

স্কোয়ারে রমেশ পালের ঠাকুর, মহম্মদ আলি পার্কের বর্ণাঢ্য মণ্ডপ, সিমলার ঠাকুর সবাই দেখে নিয়েছে। তা কি বলব, ঠিক এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে শনিবার এসে পড়েছিলাম কোতরং গ্রামের একটি মণ্ডপে।

মণ্ডপ বললে ভুল হবে-কোন সামিয়ানা নেই কিছু নেই। সামনে একটা কানাগলির মুখে একটা গেট আর তাতেই লেখা আছে- "বন্দেমাতরম"। আসুন অভিনব দুর্গা প্রতিমা দর্শন করুন।

গলির মুখেই রয়েছে একটা নিমগাছ।

এখানে একদল ছেলে বসে আছে, কাঠের ফোল্ডিং চেয়ারে। সবাই নব্য, ভব্য সদালাপী বিশিষ্ট ভদ্র। সামনে সিমেণ্টের বসবার বেদীতে বাজছে ষ্টিরিও টেপে দেবী দুর্গার স্তোত্র পাঠ। সেই বীরেন ভদ্রের চণ্ডীপাঠ—সুললিত মন্ত্রোচ্চারণ। নিমগাছের মাথার ওপর ঝুলছে মাত্র একটি মারকারী ল্যাম্প। এতেই আলোকিত হয়ে রয়েছে সমস্ত চত্বরটা। বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে বীরেন ভদ্রের চণ্ডীপাঠ শুনলাম। তারপর আর কি।

নিশ্চয়ই ঠাকুর আছে এখানে এই ভেবে ক্যামেরা কাঁধে ঢুকেই পড়লাম সেই গলিপথে।

কিন্তু কোথায় ঠাকুর। কি ব্যাপার!

আরও একটু ঢুকতেই দেখতে পেলাম একটি পোষ্টারে লেখা। —আসুন অভিনব দুর্গা প্রতিমা দর্শন করুন। আসুন, দেখুন এবং যাবার পথে আপনার মন্তব্য লিখুন। ঠিক এই পোষ্টারটির নীচে রয়েছে একটি টেবিল আর টেবিলের ওপর একটি মোটা বাঁধানো বই—ভিজিটার্স বুক। যাতে প্রতিমা দর্শন অন্তে সবাই লাইন করে একে একে তাদের মন্তব্য লিখে যাচ্ছেন।

কি ব্যাপার! আরও বিস্ময়!

প্রতিমা কোথায়? কিছুইতো নজরে আসছে না। এদিকটা আবার বেশ অন্ধকার।

কাউকে জিজ্ঞাসা করব। সেওতো বোকা কাণ্ডকারখানা হয়ে যাবে। সুতরাং আরও একটু এগিয়ে গেলাম।

দেখলাম রাস্তার বাঁদিক ঘেঁসে একটা পাঁচিলের ওপর সাদা জিন কাপড়ে আটকান রয়েছে বেশ কিছু দুর্গা প্রতিমার ছবি। তা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ খানা হবে। ছবিগুলোর মাথায় ও নীচে একটি করে টিউব লাইট জ্বলছে। ফলে দুর্গা প্রতিমাগুলি হয়ে উঠেছে সমুজ্জ্বল।

একটি ছোকরা এসে আমাকে একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল দাদা এইখান থেকে শুরু করুন।

আমার সন্দেহ তখনও কাটেনি। কারণ আমি এসেছি দুর্গা প্রতিমা দর্শন করতে, প্রদর্শনী দেখতে নয়। তবু ছেলেটির কথামত প্রথম থেকেই শুরু করলাম। ছবিতে দুর্গা দর্শন করতে। কি বলব ঠিক যা দেখেছি তারই বিবরণ এই গল্পে বিস্তারিত দিলাম।

প্রথমেই দেখলাম ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দণ্ডায়মান এক বিরাট তৈলচিত্র। একটি টেবিলের পাশে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর ডান হাতের কাছে খোলা একটি বই—নাম আনন্দমঠ।

তারপরই দেখলাম সেই অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি।

নীচে লেখা—মা যা ছিলেন।

"ইনি কুঞ্জার কেশরী প্রভৃতি বন্য পশু সকল পদতলে দলিত করিয়া বন্য পশুর আবাস স্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কার পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী।

ইহাকে প্রণাম কর"।

জগদ্ধাত্রীরূপিনী মাকে প্রণাম কর।

বল বন্দেমাতরম্।

প্রথম সিরিজে এরূপ বেশ কয়েকখানি ছবি যা সকলের নজর কাড়ে। ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসে। প্রতিমা দেখার স্বাদ পূরণ করে বৈচিত্র্যের গুণে।

দ্বিতীয় সিরিজের দিকে এগোতেই চোখে পড়ল এক কালীমূর্তি। নীচে লেখা আছে—"দেখ মা যা হইয়াছেন।"

" কালী অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী হৃতসর্ব্বস্বা। এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন।

—হায় মা।"

বল বন্দেমাতরম্।

এখানেও রয়েছে বেশ কিছু কালী মূর্তি। দেখলে ভয় হয়। করালবদনী, বিভীষণা, আবার কোনটি শান্ত স্নিগ্ধ মূর্তি বিশিষ্ট। কোনটির পদতলে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃপূজায় ব্যস্ত। কোনটিতে বা রামকৃষ্ণদেব মায়ের মুখে প্রসাদ গুজে দিচ্ছেন।

ভাল লাগল।

সকলের অলক্ষ্যে সমবেত এই কালী মূর্তিদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম। মাগো দৈত্যদলনী অসুরনাশিনী দেশকে এবার রক্ষা কর মা। অসুর নিধন কর, এদের মনে ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও—এদেরকে মানুষ কর। সন্ত্রাস দূর কর।

পা পা করে এগিয়ে তৃতীয় সিরিজের ছবির সামনে এসে দাঁড়ালাম।

এখানে বেশ কিছু ছবি। প্রতিটি বৈচিত্র্যময়।

সবই দশভূজা দুর্গার প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছবি। নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন। নীচে লেখা এই মা যা হইবেন।

দশভূজা দশ দিকে প্রসারিত তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা।

দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণধারিনী শত্রুবিমর্দ্দিনী বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িণী সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।

এস আমরা মাকে প্রণাম করি।

দুর্গাকে প্রণাম করি।

বল বন্দেমাতরম্।

বল "সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে—
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়নি নমোহস্তুতে।
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা।।
ত্বং শ্রী স্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রী স্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।।
লজ্জা পুষ্টি স্তথা তুষ্টি স্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ।।"

এর পরও রয়েছে একটি বিরাট তৈলচিত্র। শিল্পী বি, পাল। যাতে আঁকা রয়েছে নটরাজের প্রলয়ঙ্করী নৃত্যের সেই ভঙ্গী। যাতে ফুটে উঠেছে দেশের হানা-হানির ছবি, বিধ্বংসী কোন অগ্নিকাণ্ডের ছবি, এমনকি প্রলয়ঙ্করী ভুমিকম্পের ছবিও প্রস্ফুটিত্‌।

ছবির বক্তব্য—এবার মা স্বয়ং যেন সব ধ্বংস করতে নেমে এসেছেন সেই শিবলোক থেকে। পৃথিবীটা যেন ভয়ঙ্কর অন্যায় আর ভ্রষ্টাচারে, ব্যভিচারে ভরে গেছে। তাই মা সবাহণ সপরিবারে নেমে এসেছেন এই ভ্রষ্টাচার দূর করতে—ব্যভিচার আর অনাচার দূর করতে। দৈত্যদলনী মা তোমায় প্রণাম।

মৃন্ময়ী মূর্তি দেখতে না পেলেও সব দেখে সেই চিন্ময়ী মাকে দেখার স্বাদ পেলাম। মনে মনে আবারও প্রণাম করলাম মাথা নত করে সেই যোগমায়ার উদ্দেশ্যে বললাম—তুমি মা দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী সর্ব মঙ্গলদায়িনী বরাভয়দাত্রী। তুমি মা শক্তি। তুমিই মা শান্তি। তুমি মা রক্ষা করো তোমারই সৃষ্ট এই পৃথিবীকে, তোমারই স্থিতি এই প্রকৃতিকে। তোমাকে নমস্কার।

সর্বশেষ ছবিটিতে শুধুই মা দুর্গার মুখটি দেখা যাচ্ছে আকাশে এক ঝাঁক মেঘের মধ্যে আর নীচে কাশ ফুলের বনে দাঁড়িয়ে ভক্তবৃন্দ হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে। নীচে লেখা সেই পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি—

সব শেষে রয়েছে প্রতি সিরিজে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের নাম ধাম আর তারই নীচে এই উদ্যোক্তাদের নাম একতা পরিষদ সন্তানদল।

"বাঃ" বড় ভাল লাগল।

চাক্ষুষ না দেখলে এমন পরিকল্পনার কথা কোন দিন মাথাতে আসত না।— সংঘের উদ্যোক্তাদের জানাই বাহবা আর ধন্যবাদ। নৈব নৈবচ খরচ করেও যে এমনতর অভিনব পূজা করা চলে এ ভাবা যায় না। দুর্গা পূজার সর্বাধুনিক পদ্ধতির যে প্রচলন আপনারা করলেন তার জন্য জানাই—সাধুবাদ। আশা করি আগামী বছরেও এমনি পূজায় অনেকেই ব্রতী হবেন। ইতি—

মন্তব্য লেখা শেষ করে আমি সংঘের সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানলাম এই পূজা পরিকল্পনাটি নাকি তাদের শ্রদ্ধেয় অজিতদার। উনিই গত বছর ওদের এই পরিকল্পনাটি দেন। তাই এবছর বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিনটিতে পাশেই মায়ের নাট মন্দিরে বসে আঁকার এক প্রতিযোগিতা হয়। তা প্রায় ৩৫জন ছেলে মেয়ে এই প্রতিযোগিতায় নাম দেয়। বিষয় ছিল সেই আনন্দমঠের—মা যা ছিলেন, মা যা হয়েছেন এবং মা যা হবেন। প্রদীপবাবু আরও জানালেন প্রতিযোগিতায় যোগদানে প্রতিযোগীর কাছ থেকে এক টাকা করে প্রবেশ মূল্যও নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে আমাদের সদস্যদের চাঁদাও আছে-আর আছে স্বেচ্ছায় চাঁদা দান, ইচ্ছুক কিছু ব্যক্তি যারা এই পরিষদেরই উপদেষ্টা। তাতেই যতদূর পেরেছি আমরা করেছি। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে একটি মাইক আর অল্প কিছু আলোর ব্যবস্থা ছাড়া ঘটা পটার কোন বালাই নেই। না ব্রাহ্মণ না প্রতিমা না কোন আনুসঙ্গিক খরচ। তবু দেখুন এই দুটি দিনেই আমাদের এখানে দু'হাজারেরও বেশী মানুষ এসে এই পূজা তথা প্রদর্শনী দেখে গেছেন মন্তব্য লিখে গেছেন। নিন প্রসাদ ধরুন। বলে প্রদীপবাবু কাঠের বারকোষে রাখা টফির একটি মোড়ক আমার হাতে তুলে দিলেন।

সাগ্রহে প্রসাদ গ্রহণ করে বললাম সত্যি যারপরনাই খুশী হয়েছি। মন্তব্যের খাতায়ও তাই লিখেছি। আরও আপনাদের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে পেরে অভিভূত হলাম। কি বলব শত ধন্যবাদ জানাই আপনাদের এই সংস্থাকে। আপনাদের মাতৃপুজা সার্থক হোক্—

বলুন বন্দেমাতরম্।

বললাম বন্দেমাতরম্।

বেরবার মুখে একটি কাঠের বাক্স দেখিয়ে প্রদীপবাবু বললেন মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্পে দুর্গতদের জন্য কিছু সাহায্য করবেন না?

ওঃ নিশ্চয়ই।

ওদের মাইকে তখনও মাতৃমন্ত্র, চণ্ডীপাঠের হালকা সুর শোনা যাচ্ছিল।

কি বলব যে আমি নিজের বাতিক শুধু ছবি তোলা আর পুজো প্যাণ্ডেলে ঠাকুরের বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়ান সেই আমি এ ধরণের বৈচিত্র্য দেখে সত্যিই মুগ্ধ। উপলব্ধি করলাম এদেরই আনন্দমঠ পড়া সার্থক হয়েছে। এরাই প্রকৃত সন্তান দল। তবে কি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট বন্দেমাতরম্ মন্ত্র এবার সফল হতে চলল।

স্বগতোক্তি করলাম—হবেও বা।

বন্দেমাতরম্।

কাবুলি পুষির কথা

সেদিন আচার্য তারকদাস মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে ক'জন ছাত্র আমাকে দেখেই বলে বসল আপনার লেখা অসি রায়ের সেরা গল্প আমরা পড়েছি। খুব ভাল লেগেছে। বিশেষ করে এক ভূত, এক পেত্নীর গল্পটা অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। —যাই হোক আজ যখন আপনার সঙ্গে দেখা হোল, একটা বিশেষ অনুরোধ করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমাদের।

বললাম—কি অনুরোধ খুলেই বল।

ছাত্ররা সমস্বরে বলল আপনার মুখ থেকে একটা গল্প শুনতে চাই আমরা। বলবেন কি?

বললাম—তোমাদের স্যারের আপত্তি হবে না ত?

তারকদাস মিত্র বললেন—না, না আপত্তি কিসের। ওদের পড়া হয়ে গেছে। তাছাড়া আপনি গল্প বললে আমারও শোন হয়ে যাবে।

যাই হোক গল্প একটা বলতেই হ'বে। অনেকদিন হোল শিশু বা কিশোরদের জন্য কোন গল্প লেখাও হয়নি, শোনাবারও সুযোগ পাইনি।

বললাম—বেশ তবে শোন। একটা সত্যি ঘটনাই বলি। এখন অবশ্য গপ্পো হয়ে গেছে। তবে খুব মজার গপ্পো। একটা বেড়ালের গল্প।

তখন আর আমার কতই বা বয়স হবে। ষোল সতের হবে। কোন্নগর হাইস্কুলে নাইন টেনে পড়ি। ১৯৪৫ সাল। তখনও আমরা স্বাধীন হইনি। মানে তখন ইংরেজ রাজত্বে বাস করছি।

আমি স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে রোজ সন্ধ্যেবেলা ভদ্রকালী বিশালাক্ষ্মী সড়কের গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে যেতাম।

ওটা ব্যানার্জীবাবুদের ইটখোলা।

রাস্তার দুধারে ব্যানার্জী ব্রাণ্ড ইটের বিশাল থাক করা থাকত আর মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা গঙ্গার ঘাটে চলে গেছে।

ঘাটের বাঁ দিকটায় খুব উঁচু একটা মাটির ঢিবি ছিল। দূর থেকে দেখলে ছোটখাট একটা পাহাড় বলে মনে হোত। পাশেই ছিল একটা

বিশাল উঁচু এবং মোটা তেঁতুলগাছ।

তেঁতুলগাছের পাশে বাঁধান চাতালে ছিল বিশালাক্ষ্মীর মন্দির। আর ছিল একটা টালীর ছাউনী দেওয়া কুঠরি। ও পাশে ছিল শ্মশান। যারা মড়া পোড়াতে আসত তারা ঝড় বৃষ্টি হলে এই ঘরটাতে এসে বসত। আবার যেসব মড়া শ্মশানে এসে হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেত তাদের আর বাড়ী ফিরে যাবার উপায় থাকত না বলে এই কুঠরিতেই থাকতে হোত।

এ রকম একটা বৃদ্ধকেও আমরা দেখেছি।

তাকে নাকি সাপে কামড়ে ছিল। মড়াটাকে গঙ্গার ধারে নামিয়ে যখন শববাহীরা ঘরে বসে ঢুকু ঢুকু কালীমার্কা খাচ্ছিল তারা হঠাৎ বুড়ো মড়াকে উঠে বসতে দেখে দে চোঁচা দৌড়। আর কেউ বুড়োকে ফিরে নিয়ে যেতেও আসেনি।

গ্রামের তাবড় মাষ্টারমশাই, ভুবন মাষ্টারমশাই এই লোকটাকে বাঁচিয়েছিল, তার ভরণপোষণ দিয়ে।

এই তো গেল বিশালাক্ষ্মী সড়কের চৌহদ্দী।

ডান দিকটায় ছিল সবুজ ঘাসে ভরা একটা মাঠ। এই মাঠেই এসে বসত যত বুড়ো, বুড়ী, ছেলে, ছোকরার দল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলত এদের গল্প গুজব আর আড্ডা।

গঙ্গার ওপারে আদ্যাপীঠের মন্দির। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির। দক্ষিণ দিকে গঙ্গার ওপর বালী বিবেকানন্দ ব্রীজটা এখান থেকে ভালই দেখা যেত।

যখন এই ব্রীজ দিয়ে ট্রেন যায়, গুড় গুড় করে ট্রেন যাওয়ার শব্দটা এখান থেকে ভালই শোনা যায়। শুনতে বেশ ভালও লাগে।

যাই হোক এই গঙ্গার ঘাটেই আমি সেদিন সাইকেল চেপে ওই রাস্তা দিয়ে আসছিলাম।

গঙ্গার ঘাটের কাছে সবে মাত্র নেমেছি হঠাৎ খুব নীচু দিয়ে, যেন ঠিক মাথার ওপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে গেল ওপারে দমদমের দিকে।

প্লেনের শব্দটা তখনও কান থেকে মিলিয়ে যায়নি।

পরক্ষণেই পথের ডান দিকটায় যেখানে একটা ছোট্ট তালগাছ ছিল তার পাতার ওপর ঝুপ করে একটা শব্দ হোল।

কি পড়ল যেন তালপাতায়!

তাকিয়ে দেখি ছোট্ট একটা বিড়ালছানা। গায়ে হলুদ আর কালো লম্বা লোমে ভর্তি। পরক্ষণেই মিউ করে একটা শব্দ করল বেড়ালটা।

আরে বেড়ালছানাটা এল কোথা থেকে?

তখনও বিস্ময় কাটেনি।

কেউ তো এদিকটায় নেই। তাছাড়া তালপাতার ওপরই বা পড়ল কিভাবে!

ঠিক নিশ্চিত না হলেও এটা ধরে নিলাম যে বেড়ালছানাটা ওই প্লেনটা থেকেই পড়েছে। প্লেনের মধ্যে কেউ হয়ত ওকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে চেয়েছিল। তা বেড়ালটার বরাত ভাল জলে না পড়ে ডাঙ্গায় এই কচি তালগাছটার পাতার ওপর পড়েছে। রাখে কেষ্ট মারে কে একেই বলে। যাক বেঁচে গেল বেড়ালটা।

কিন্তু বেড়ালটাকে ধরতে হবে যে।

কি সুন্দর দেখতে বেড়ালটাকে। এক নজরেই সকলের দৃষ্টি কাড়ে। কিন্তু ধরব কি করে। যদি কামড়ে দেয় বা আঁচড়ে দেয়। সে ভয়ও হচ্ছে।

তবু চেষ্টা করতেই হবে।

চকিতে সাইকেলটা ওদিকে ফেলে দিয়ে নিজের পরা ধুতি কাপড়ের কোঁচাটা খুলে নিলাম। পরমুহূর্তে জাল ফেলার মত করে কাপড়টা ঘুরিয়ে বেড়ালটাকে চাপা দিয়ে যা হোক করে ধরে ফেললাম।

তারপরই সাইকেলটা তুলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কাছেই আমার বন্ধু মধুসূদনের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলাম।

বেড়ালছানাটা ইতিমধ্যে কাপড়ের মধ্যে ভীষণ হুটোপাটি করতে আরম্ভ করছিল।

তারপর আর কি।

মধুর মাকে আমিও মা বলি। বললাম—মা শিগগির একটা ঝুড়ি নিয়ে আসুন। কি সুন্দর একটা বেড়ালছানা কুড়িয়ে এনেছি দেখুন।

পরমুহূর্তেই বাবু ওরফে ভুবনবাবু—ওরফে বন্ধুবর মধুসূদনের বাবা ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় এসে হাজির।

ভুবনবাবুই বেশী করে সাহায্য করলেন। কোঁচড় থেকে বের করে প্রথমে ওটাকে ঝুড়িচাপা দেওয়া হো্ল।

এরপর সেই বেড়াল দেখে আর বেড়াল পাওয়ার গল্প শুনে সবাই কি খুশী।

ভুবনবাবুই বললেন এটা কাবলি বেড়াল। ছেলে বেড়ালও বটে। হয়ত প্লেনে দুষ্টমি করছিল তাই কেউ আপত্তি করাতে ওকে বেড়ালের মালিক গঙ্গায় ফেলে দিতে কক্‌পিট খুলে দিয়েছিল। বেটা বেড়ালের কপাল ভাল বেঁচে গেছে।

এরপর আর কি।

ঝুড়ি চাপা দেওয়া বেড়ালছানা একটু পরই ভুবনবাবুর সেবা শুশ্রূষা পেয়ে প্রথমেই একবাটি দুধ চুক চুক করে খেয়ে একটা হাই তুলে শান্ত শিষ্ট হয়ে বসে রইল।

না ছট্‌ফট্‌ করছে, না পালাবার চেষ্টা করছে দেখে বাবু তো রিস্ক করে ওকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। তারপর আদর, আদর আর আদর।

বেড়ালের মাথায় হাত বুলোনো, গলা চুলকে দেওয়া। এসব কিছুক্ষণ করতেই বেড়ালবাবু তো সন্তুষ্ট হয়ে ভুবনবাবুর কোলে শুয়ে এক ঘুম।

তারপর এরই ফাঁকে ভুবনবাবু বেড়ালের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন একটা ছোট্ট পেতলের ঘণ্টি আর বেঁধে দিলেন একটা লাল ফিতে।

প্রথম প্রথম ফিতে দিয়ে একটা খুঁটিতে বেঁধেও রাখা হয়েছিল। সেও মাত্র এক দিনের জন্য।

বেড়ালটা শেষ পর্য্যন্ত পোষ মানল।

বড় হয়ে উঠল। আরও লোভনীয় হয়ে উঠল ওর সুন্দর লোম আর মুখশ্রীর জন্য।—আহা বেড়াল তো নয় মার্জার। ঠিক যেন পোষ মানা একটা বাঘের বাচ্চা।

এবার ভুবনবাবু সম্বন্ধে কিছু বলি শোন —

এই ভুবনবাবুর বেড়াল পোষার একটা বাতিক ছিল। বাড়ীতে আট দশটা বেড়াল ছিল তার। কোনটা পুষি, কোনটা মেনি, কোনটা হুলো। এর ওপর আবার একটা বাড়ল।

তবে এটা দেশী বেড়াল নয়। বিদেশী বেড়াল। কাজেই এর খাতির যত্নই আলাদা।

এই ভুবনবাবু যখনই খেতে বসতেন তখন সবকটা বেড়াল গোল হয়ে বাবুর ভাতের থালা ঘিরে খেতে বসত। বাবুর সঙ্গে একই সঙ্গে খেত ওরা। দুধ ভাত, মাছ ভাত এ সব ত ছিলই, কোন কোন দিন দই ভাত মাছ ভাতও হোত।

বিদেশী বেড়ালবাবুর জন্য আলাদা একটা থালাই কেনা হয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত। দেশীগুলো মেঝেতেই খেত আর ওকে থালায়।

তারপরও ব্যাপার ছিল।

বাবুর প্রতিটি বেড়ালের আলাদা আলাদা নাম ছিল। একজনের নাম ছিল মেনি, অপরের নাম টুসি, কাল্‌টি, হুলো, তুলসী, লালটু, বুলটি, লক্ষ্মী কত কি নাম।

কুড়িয়ে পাওয়া এ বেড়ালেরও নামকরণ হোল শেষ পর্য্যন্ত। নাম হোল কাবুলি পুষি।

তিনটে মাস তো কাটেনি, তারই মধ্যে কাবুলিপুষির এইস্যা গতর হয়ে গেল খেয়ে দেয়ে। তাছাড়া সর্বাধিক যত্ন পেত ও ভুবনবাবুর কাছে। একই সঙ্গে খাওয়া, একই সঙ্গে বিছানায় শোয়া। তারপরে কাবুলি পুষির জন্য একটা আলাদা তোয়ালে, একটা নরম পাতলা বালিশ। গলায় সেই লাল ফিতেতে ঝুলছে রূপোর ঝুমুর। পেতলের ঘণ্টির থেকে ঝুমুরএর আওয়াজ অনেক মিষ্টি।

বাবু কাবুলি পুষি বলে ডাকলেই যেখানেই থাকুক বেড়ালটা ছুটে এসে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে মিউ করে সাড়া দিত। বাবু ওকে কোলে তুলে নিতেন। তারপরই কাবুলি পুষির নিশ্চিন্তে এক ঘুম।

এই তো গেল বেড়ালের আদি পর্ব তথা জন্ম বৃতান্ত।

এবার বেড়ালের বিয়ের কথাটাও শুনুন।

তারক দাস মশাই তারিফ করে শুনছিলেন মার্জার কথা। বললেন বলুন।

তারপর ছয় মাস বয়সেই কাবুলি পুষির ওজন হয়ে গেল ১৫ কেজি মত। গায়ে হলুদ আর কালো রঙের লম্বা লম্বা লোম। লম্বা খরগোসের মত কান, গোঁফের চুলেও কি বাহার। তারপর কটা চোখের চাউনি তো নয় যেন জলন্ত মার্বেলের চোখ। মোট কথা এক দৃষ্টিতে ও সক্কলকে সম্মোহিত করতে পারে এমনই দৃষ্টি ওর।

ভদ্রকালীর ষষ্ঠীতলায় থাকতেন আর এক মানুষ। সঞ্জয়বাবু। কি যেন টাইটেল ভুলে গেছি। তারও এমনি বেড়াল পোষার বাতিক ছিল।

সঞ্জয়বাবুর একটি মাত্র মেয়ে ছিল অর্চনা।

অর্চনার ছিল একটি পোষা মেনি বেড়াল। হলুদ রঙের ওপর সাদা ছাপ। ভারী সুন্দরী দেখতে ছিল এই মেনি বেড়ালকে।

অর্চনা ছোট বেলায় পুতুল নিয়ে খেলত আর এই বেড়ালছানাকেও নিয়ে খেলত।

অর্চনা যখন পড়ত বেড়ালটা ওর কাঁধে বসে থাকত। আবার যখন খেলত বেড়ালটাও শুয়ে গড়িয়ে লেজ নেড়ে কত রকমই না খেলা দেখাত অর্চনাকে।

একদিন অর্চনা তার বাবার কাছে প্রস্তাব দিয়ে বসল—বাবা আমার মেয়ের বিয়ে দেব। তুমি শিগগির ছেলে বেড়ালের খোঁজ কর। কাছে পিঠে না পেলে কাগজে বিজ্ঞাপন দাও বুঝলে।

অর্চনা সঞ্জয়বাবুর একমাত্র আদুরে মেয়ে। মেয়ে যা বলে সঞ্জয়বাবু তা শোনেন। বলে ঠিক আছে মা তোমার মেয়ের পাত্র দেখছি। তুমি চিন্তা করো না।

শেষ পর্য্যন্ত সঞ্জয়বাবু ভুবনবাবুর কাবুলি পুষির সন্ধান পেয়ে একদিন ওনাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির। ছেলে দেখে সঞ্জয়বাবু খুব খুশী। বললেন বিয়ে দিতে চাই আমার মেয়ের মেয়েবেড়াল রূপসীর সঙ্গে। তাই আমি আপনার দারস্থ। এখন উদ্ধার করুন।

ভুবনবাবু সব শুনলেন। বললেন বিয়েতে আমি রাজী। তবে একটা শর্ত আছে।

শর্তটা হোল কি, যে আমি বউ এনে আর পাঠাতে পারব না। রূপসীকে দেখে আমার কাবুলি পুষি যদি পছন্দ করে ঝগড়া ঝাটি না করে তবে আপনাদের রূপসী অবশ্যই এ বাড়ীতে বরাবরের মত আদর যত্নেই থাকবে।

শর্তের ওপর শর্ত, ভুবনবাবু আরও বললেন বিয়ের তো একটা খরচ খরচা আছে সেটা কিন্তু সব আপনার। আমি শুধু মাত্র ক'জন বরযাত্রী আর বর কাবুলি পুষিকে নিয়ে আপনার বাড়ী যাব।

সঞ্জয়বাবু সবেতেই রাজী।

কিন্তু সঞ্জয়বাবুর মেয়ে অর্চনা যখন বুঝতে পারল যে বিয়ে দেবার পর রূপসী ভুবনবাবুর বাড়ীতে চলে যাবে এবং ওখানেই থাকবে তখনই ভেঙ্গে পড়ল কান্নায়।

যাই হোক অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে অর্চনাকে ঠাণ্ডা করা হোল। রূপসী এবং কাবুলি পুষিকে মাঝে-মাঝেই এবাড়ীতে আনা হবে। সে ব্যবস্থা ভুবনবাবুকে বলে অবশ্যই করা হবে।

এর পরই ঘটে গেল সেই বেড়ালের বিয়ে।

বিদেশী বেড়ালের সঙ্গে দেশী বেড়ালের অভুতপূর্ব বিয়ে।

সঞ্জয়বাবুর বাড়ীর ছাদে বিরাট প্যাণ্ডেল বাঁধা হোল। এল কত লোকজন। কত নেতা, কত আত্মীয়-স্বজন কুটুম্ব। শিবতলা থেকে ষষ্ঠীতলা পর্য্যন্ত সারি সারি চকচকে ঝক্ঝকে গাড়ীর সমারোহ।

দল দল বৌ ঝি, কত্তা, গিন্নী আত্মীয়-স্বজন নামলেন ফুলের তোড়া বোকে আর বিয়ের উপহার সামগ্রী নিয়ে।

ছাদে ছাঁদনাতলাও হয়েছিল একটা।

এসেছিল ব্যাণ্ড পার্টির দল। এসেছিল আলোর রোশনাই কত কিছু।

শেষ পর্য্যন্ত বর কাবুলি পুষিকে নিয়ে ভুবনবাবু গিলেকরা ধুতি পাঞ্জাবী পরে নামলেন।

ছাঁদনাতলায় রূপসীকে নিয়ে আসা হোল। ব্রাহ্মণ এসে মন্ত্রচ্চারণ করে মাল্যদান করাল। ক্লিক ক্লিক করে কত না ছবি উঠল। মাইকে গান বাজল। বাজল সানাই, বাজল ইংরিজি বাজনা। তারপর খাওয়া দাওয়া ভুরি ভোজ। ইত্যাদি সব শেষে বেড়ালবর কাবুলি পুষির সঙ্গে রূপসীর বিয়ে সাঙ্গ হোল।

কন্যাযাত্রীরা যারা নামী দামী গাড়ী করে বিয়ে দেখতে এসেছিলেন তারা ফিরে যাবার প্রাক্কালে সঞ্জয়বাবুর কাছে একটিই অনুরোধ জানালেন রূপসীর বাচ্ছা হলে অবশ্যই যেন আমরা ওদের একটি করে বাচ্ছা পাই।

সঞ্জয়বাবু অবশ্য বিনীতভাবে সকলকেই জানিয়েছিলেন যেহেতু রূপসী ভুবনবাবুর বাড়ীতেই থাকতে চলেছে তখন ওনাকেই বরং অনুরোধটা করে গেলে ভাল করতেন।

যাই হোক বিয়ের পর ভুবনবাবু কাবুলি পুষি ও পুষির বউ রূপসীকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। সঞ্জয়বাবুর মেয়ে অর্চনাও এসেছিল একই সঙ্গে ভুবনবাবুর বাড়ীতে।

ফিরে যাবার সময় অর্চনা কেঁদে কেটে একশা। ভুবনবাবু অর্চনার শোকে দুঃখে নিজেও বিচলিত হয়ে পড়লেন। বললেন কেঁদ না মা—কেঁদনা। আমার কাবুলি পুষি আর তোমার রূপসী অবশ্যই মাসে দু'দশ দিন করে তোমাদের বাড়ীতে যাবে। আর নিতান্তই যদি তুমি ওকে ঘর জামাই করে রাখতে চাও ভেবে দেখব।

অথ ঃ মার্জার কথা সমাপ্ত।

বায়স বলি কথা

আর কে ঘোষ। ওরফে রতিকান্ত ঘোষ।

ঘোষপাড়ার এই রতিকান্ত ঘোষকে কে না জানত। বেঁটে খাটো মানুষ। রেলে কাজ করতেন। সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন।

মাথায় বেশ বড় রকমের টাক। তবে কানের পাশে বা ঘাড়ের চুল সব ঠিক আছে। টিকোলো নাক। নাকে ডাণ্ডি দেওয়া গোল চশমা। বেশীর ভাগ সময় ফতুয়া ও পাজামা পরতেন।

একটু শুচিবাইগ্রস্থ মানুষ।

না ঠিক সে রকম নয়। এটা ছোঁব না ওটা মাড়িয়ে ফেললুম আবার স্নান করতে হবে এরকমটা নয়। তবে নোংরা কোন কিছুই দেখতে পারতেন না। সে বাড়ীর আস্তাকুঁড়ের আবর্জনাই হোক বা বাড়ীর আশ পাশে পথের ধারে কোন নোংরাই হোক তাঁর চোখের সামনে পড়ে থাকার জো ছিল না।

নিজে সাত সকালে উঠে বাড়ীর চারপাশ ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে রাখতেন। উঠোনে বা বাড়ীর সামনের বাগানে একটি শুকনো পাতাও পড়ে থাকত না। ঘোষ মশাইয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই বাতিকপনার জন্য।

বাড়ীর আনাচ কানাচ, পথ ঘাট বাগান বাড়ী ইত্যাদি সব পরিষ্কার হয়ে গেলে পর উনি কাঁধে একটা গামছা ফেলে পথের ধারের ভেরাণ্ডা গাছের একটা ডাঁটা ভেঙ্গে দাঁত মাজতে মাজতে গঙ্গায় যেতেন স্নান করতে।

একদিন হয়েছে কি উনি গঙ্গা স্নানে যাবার পথে বাড়ীর একটু দূরে বড় রাস্তার ধারে ময়লা ফেলার জায়গায় দেখলেন একটা মরা কাক পড়ে আছে। আর সেই মরা কাকটাকে ঘিরে কত না কাক এসে এ গাছে ও গাছে ইলেকট্রিক তারে বসে তারস্বরে চিৎকার করছে—কা-কা-কা।

কাকেদের কথার যদি মানে ধরা যেত তবে বলা চলত ওরা বলছে,

ওরে তোরা কে কোথায় আছিস সব শিগগির করে এখানে এসে জড়ো হ'। দেখে যা আমাদের মধ্যে কে না কে মরে পড়ে আছে।

সুতরাং কাক সর্দারের ডাকে ছোট কাক, বড় কাক, ছেনি কাক, আরও কত কাকিনীর দল এসে মরা কাকের ধারে বসে চীৎকার শুরু করে শোক প্রকাশ করতে লাগল। কেউ বা মরা কাকটার ডানা ধরে এক বার টানা টানিও করে দেখল। দেখে নিতে চায় ওটা সত্যি মারা গেছে না আঘাত লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে কিনা।

যাই হোক আর কে ঘোষ মশাই সেদিন এই পথ দিয়ে স্নানে যাবার সময় এই মরা কাকটাকে দেখে ওর একটা ঠ্যাং ধরে তুলে চললেন গঙ্গার ধারে। উদ্দেশ্য কাকটাকে গঙ্গায় ফেলে দিতে হবে। নইলে আঁস্তা-কুঁড়ে পড়ে পচে দুর্গন্ধ ছড়াবে।

রতিকান্ত বাবুর এই স্বভাবটা বরাবরের।

সে মরা কুকুরই হোক, মরা বেড়ালছানাই হোক বা মরা বাছুরই হোক। উনি মেথর টেথর না ডেকে নিজেই বয়ে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে ওদের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটাতেন।

আমি আবার পরিবেশ দূষণ নিয়ে খুব খানিকটা মাতামাতি করি। বিশেষ করে প্রতি বছর জুন মাসের পাঁচ তারিখে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এই দিনটিতে আমি সকলকে উপদেশ দিয়ে বেড়াই—আপনারা অকারণ জল দূষণ করবেন না, বায়ু দূষণ করবেন না। নিজেদের পরিবেশ নিজেরা সাফ্-সুরত রাখুন ইত্যাদি।

এই রতিকান্ত বাবুকে আমি কত বার মানা করেছি — ও মশাই, আপনি আপনার ওই বাতিকটা কমান তো মশাই। ও সব মরা কুকুর, গরু, বাছুরকে কে আপনাকে গঙ্গায় ফেলতে বলেছে। ওগুলো গঙ্গায় ফেললে গঙ্গা দূষণ-মানে জল দূষণ হচ্ছে এ কথা আপনি জানেন না। এমনিতেই তো কলকারখানার নোংরা জল পড়ে মা গঙ্গা ক্রমশঃ অপবিত্র হয়ে আসছে। তাতে আপনি সব জেনে শুনেও আবার ওই সব বাতিকি কাজ কর্ম করে চলেছেন। তেমনই যদি কিছু করতে মন চায় তো যাননা একটা কোদাল নিয়ে ফাঁকা মাঠে গঙ্গার পাড়ে জমিতে গর্ত করে ওগুলো

কে পুঁতে দিন। ব্যস মিটে গেল ঝন্‌ঝাট। তা না যতসব কেলোর কীর্তি।

তা রতিকান্ত বাবু আমার কথা কানেই তুলতেন না। হেসে উড়িয়ে দিতেন সব কথা। অভ্যাসটা যাবে কোথা? সেদিনের সেই মরা কাকটাকে নিয়ে কিন্তু ঘটল এক অনর্থ। অনর্থ বলে অনর্থ-সে এক অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। রতিকান্তবাবু তো কাকটার ঠ্যাং ধরে নিয়ে চলেছেন। তা দেখে কাকের দল রতিকান্ত বাবুর পিছু নিল। কোথা থেকে মুহূর্তে শত সহস্র কাক এসে জুটল। উড়ে চলল তারা রতিকান্ত বাবুর পথ ধরে গঙ্গার ধারে। আর সে কি বিকট চিৎকার। কা-কা-কা-কা। ৬৫ ডেসিবেল কেন ২৬৫ ডেসিবেলের মত শব্দ করে পাড়া মাত করে দিল কাকেদের চিৎকার।

রতিকান্তবাবু হাঁটছেন। বাঁ হাতে ধরা মরা কাকের ঠ্যাং। ডান হাতে গাব ভেরেণ্ডার ডাঁটা। দাঁত মাজার কাজ চলছে।

রতিকান্তবাবুর ঠিক মাথার ওপর দিয়ে কাকের দল উড়ে যাচ্ছে।

কি জানি ঠোক্কর ফোক্কর মারবে কি এই ভয়ে রতিকান্তবাবু কোন রকমে কাঁধের গামছা খানা খুলে মাথার টাকটা চাপা দিলেন। কাকেরা কিন্তু শুনল না। সেই চিৎকার, সেই পিছু নেওয়া সমানে বজায় রেখেই চলল ওরা। রতিকান্তবাবু শেষ মেষ বলতে বাধ্য হলেন,—এতো ভারি ঝামেলায় ফেলল দেখছি কাকগুলো।

এর একটু পরেই রতিকান্তবাবু বৈদিকপাড়ার গঙ্গার ঘাটে এসে পৌঁছলেন। এসেই এক কোমর গঙ্গার জলে নেমে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মরা কাকটাকে গঙ্গার মাঝ বরাবর করে।

মরা কাকটা ভাঁটার টানে ভাসতে ভাসতে কোথায় যেন চলে গেল।

এবার রতিকান্তবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে গঙ্গা স্নানে মন দিলেন। ভাল করে গা হাত মুছে যেই ডুব দিয়ে ওঠেন তখনি পাঁচ ছটা কাক কোথা থেকে এসে রতিকান্তবাবুর মাথার ওপর ঠোক্কর মারে।

আঃ এতো ভারি ঝামেলা হল দেখছি। বলে ভয়ে রতিকান্তবাবু আবার ডুব দেন। আবার যেই ওঠেন কাকেরা দৌড়ে এসে রতিকান্ত বাবুর মাথায় ঠোক্কর মেরে যায়। সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে রতিকান্তবাবু

তাড়তাড়ি স্নান সেরে মাথায় ভিজে গামছাটা চাপা দিয়ে প্রায় দৌড়ে বাড়ী ফিরে এলেন।

কাকেরাও এল ওঁর পিছু পিছু—তবে সংখ্যায় কম। তারপর রতিকান্তবাবু ভিজে কাপড় চোপড় ছেড়ে মাথার চোট লাগা জায়গায় ডেটল দিলেন। রতিকান্তবাবুর স্ত্রী রমলা দেবী এসব দেখেশুনে বললেন এসব করা কেন বাপু। ওরা কি আর তোমায় ছাড়বে ভেবেছ। তোমায় ঠিক চিনে ফেলেছে ওরা। নইলে গঙ্গা ধার থেকে আবারও কাকগুলো বাড়ী পর্যন্ত তোমার পিছু ধাওয়া করে।

রমলা দেবীর কথা কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। তার প্রমাণ পাওয়া গেল ঠিক এর পরদিন। রতিকান্তবাবু পরের দিন আবার যখন গঙ্গা স্নানে যাচ্ছেন কাকের ছোট একটা দল ওনার পিছু ধাওয়া করল।

গঙ্গায় স্নান করে ডুব দিয়ে উঠতেই আজও সেই কাকেদের দল এসে ওনার পরিষ্কার টাক মাথায় ঠকাস করে এক ঠোক্কর বসিয়ে দেয়।

তা এরকম ৫/৭ দিন উপদ্রব চলল কাকেদের ওই রতিকান্তবাবুর ওপর। এদিকে কাকের ঠোক্কর খেয়ে রতিকান্তবাবুর মাথায় তো ঘা হয়ে বসল। স্নান বন্ধ করতে হলো।

এমনি শুকিয়ে যাবে। ভাল হয়ে যাবে ভেবে রতিকান্তবাবু তো ATS পর্যন্ত নিলেন না। ফলে হোল কি ৮ দিনের দিন রতিকান্তবাবুর হাত পায়ে খেঁচুনী শুরু হোল। মুখ দিয়ে গাঁজলা বের হতে লাগল।

ডাক্তার এসে দেখে বলল টিটেনাস। এবং লাষ্ট ষ্টেজ। তবু এখনি আই, ডি, হস্‌পিটালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

এল এম্বুলেন্স। নিয়ে যাওয়া হোল তাঁকে বেলেঘাটা আই, ডি, হস্‌পিটালে। কিন্তু ওখানে গিয়ে ২৪ ঘণ্টাও কাটল না। নিথর হয়ে গেল তাঁর শরীর। রতিকান্তবাবু শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন।

একটা কাকের জন্য ওনার প্রাণ গেল।

কি দুঃখের কথা।

কিন্তু এরপরও একটা বিচিত্র খবর রয়েছে যা এখনও বলা হয়নি। সেটা হচ্ছে যখন রতিকান্ত বাবুকে খাটে শুইয়ে হরিধ্বনি সহকারে

শিবতলা শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন যে সব খই ছড়ান হয়েছিল বায়স বলি হিসাবে তার একটি খইও কোন কাক এসে মুখে তোলেনি। এ এক বিচিত্র ঘটনা!

আসলে আর কে ঘোষ এক নম্বরের হাড় কৃপণ মানুষ ছিলেন। শোনা যায় জীবনে বেঁচে থাকাকালীন তিনি কখনও কোন ভিখারীকে একটি পয়সাও ভিক্ষা দেননি। সকালে বা বিকালে নিজে যখন জলযোগ করতেন, চা, বিস্কুট, বা রুটির টুকরো কোন কাকপক্ষীকে দিতেন না।

কাকেদের সারাজীবনের এ দুঃখ কে বুঝবে বলুন। হয়ত বা সেই অভিমানেই কাকেরা তার শবযাত্রায় ছড়ান ওই বায়স বলি 'খই মুড়কি' কিছুই মুখে তোলেনি।

রহিম চাচার গামছা

শশী ভট্‌চাজ মশাই উত্তরপাড়া বাজার থেকে একজোড়া আনারস কিনেছিলেন গেল মহালয়ার দিন রবিবার ।

বাজারে ঢুকেই ডান দিকের উঁচু ঢিপিতে বসে যে লোকটা পান বিক্রী করত ঠিক তারই নীচটায় রহিমচাচা বসত আন্‌ কমন সব জিনিসপত্র সাজিয়ে। এই সব আন্‌ কমন জিনিসগুলো হচ্ছে আনারস, কাঁচা হলুদ, আমআদা, কাঁচা তেতুঁল, নারকেল, ব্রাহ্মী শাক, থানকুনি পাতা, কুলেখাড়া ইত্যাদি। আরও থাকত নানান রকম শাকসব্জীর দানা ।

রহিমচাচা আসত চণ্ডীতলা থেকে।

চণ্ডীতলাতেই রহিমচাচার বাড়ী । বাড়ীর পাশে ছিল শাকসব্জীর একটা ক্ষেত। একটা ডোবা পুকুরও ছিল । রহিমচাচার হাঁস-মুরগীও ছিল বেশ কয়েকটা । ডোবার চারপাশে চড়ে বেড়াত ওই সব হাঁস মুরগীগুলো ।

তা সেবার রহিমচাচার ছোট শালা সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে দিদি জামাইবাবুকে একজোড়া সিঙ্গাপুরী আনারস উপহার দিয়েছিল । ছোট শালা হোসেন মিঞা জাহাজে খালাসীর কাজ করত। খিদিরপুর ডক থেকেই তখন মাসে একবার করে জাহাজ যেত বার্মা, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুরে ।

যাই হোক রহিমচাচা সেই আনারস দু'টোর কোঁড় ভেঙ্গে এই ডোবার পাড়ে বসিয়ে দিয়েছিল । তারপর মঝে মধ্যেই আনারস হোত। বেশ বড় ধরনের আনারস । হলদে সোনালী রঙের আনারস । তাই রহিমচাচা অতি অনায়াসেই চণ্ডীতলার আনারসকে সিঙ্গাপুরী আনারস বলে চালিয়ে দিতে মোটেই কিন্তু করত না ।

একবার হয়েছে কি ডোবা থেকে আলুক্ষেতে ডোঙ্গায় করে জল ছেঁচতে ছেঁচতে দেখতে পেল একজোড়া গোখরো সাপ শঙ্খ লেগে আনারস বনে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে ।

রহিমচাচা শুনেছিল সাপে যখন শঙ্খ লাগে (সাপেদের মিলন) তখন যদি কেউ তাদের মাথায় নতুন কাপড় চাপা দিতে পারে তবে সেই কাপড়ের

গুনে অনেক অসুখ বিসুখ সারান যায় এবং যে কোন কাজ সফল হয় ।

তা লোভ সামলাতে না পেরে রহিমচাচা তার সদ্য কেনা নিজের মাথার গামছাটাই ছুটে গিয়ে শঙ্খ লাগা সাপের মাথায় চাপা দিয়েছিল ।

পরে সাপ দু'টোকে আর দেখতে না পেয়ে রহিমচাচা যেই গামছার খুঁট ধরে টানতে গেছে তখনই বড় গোখরো সাপটা মারল একটা ছোবল ।

ছোবলটা রহিমচাচার হাতে পড়েনি । পড়লে রহিমচাচার এই গল্পই হোত না । ছোবলটা পড়েছিল সম্ভবত হলুদ সোনা একটা আনারসের ওপর নয়তো বা শুধুই ওই গামছাটায় ।

যাইহোক যে যাত্রা তো রক্ষা পেল রহিমচাচা ।

রহিমচাচা অতঃপর অতি যত্ন করে সেই গামছাখানা তুলে রেখে দিল নতুন কেনা এক হাঁড়ির মধ্যে । পাড়া-পড়শীর কারও দায়-বিপদে, তড়কা রোগী, পেঁচোয় পাওয়া রোগী যার মাথাতেই ওই গামছা বুলিয়ে দেওয়া হোত তারই রোগ ভাল হয়ে যেত।

এমনকি কোর্টকাছারীতে যাচ্ছে কোন মক্কেল হয়ত এসে বলল — কইগো রহিমচাচা দাও দেখি তোমার গামছাখানা একবার আমার মাথায় বুলিয়ে । কোর্টকাছারীতে যাচ্ছি বলে কথা । যেন তোমার গামছার জোরে জিততে পারি মামলাটা ।

তা রহিমচাচার গামছা নাকি এতেও কাজ করত।

সেই রহিমচাচাই পরে সেই আনারস দু'টোকে ভেঙ্গে এনে উত্তরপাড়া বাজারে বিক্রী করেছিল । আর সে দু'টো কিনেছিল ধোপা পাড়ার শশী ভট্চাজ মশাই।

শশীবাবু ছিলেন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ।

পূজো আর্চাও করতেন । তাছাড়া নিজের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করা কালী ঠাকুরও ছিল । বাড়ীর ঠাকুরের পূজো সেরে শশীবাবু যেতেন অন্য সব যজমানদের বাড়ী পূজো করে দিতে। ঘর গেরস্থলির ঠাকুর দেবতার নিত্য পূজোটাও সেরে দিয়ে আসতেন এই শশীবাবু । এতেই যা রোজগার হোত, টাকা পয়সা ভুজ্জি যা জুটত তাই দিয়েই শশীবাবুর সংসার চলে যেত।

এই শশীবাবুই রহিমচাচার কাছ থেকে সেই সিঙ্গাপুরী কাম চণ্ডীতলাই

আনারস দু'টি গেল মহালয়ার দিনে কিনেছিলেন ।

সেদিন শশী ভট্চাজ বাড়ীর পূজো সেরে যজমানদের পূজো সেরে ঘরে ফিরে এক বাটি আনারস কুঁচোনো আর পেঁপে কুঁচোনো দিয়ে জলযোগ সারলেন ।

শশী ভট্চাজের স্ত্রী কন্যাও ফলমূল আনারস কুঁচোনো খেয়ে সিঙ্গাপুরী আনারসের তারিফ করেছিল । বড় ভাল আনারস । কি মিষ্টি আনারস ।

কিন্তু হলে কি হবে ।

শশীবাবুর মৃত্যু যে এদিকে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল তা কেউই আগে থেকে জানতে পারেনি ।

দুর্গা পূজা অন্তে বিজয়ার দিন শশী ভট্চাজ মশাই যথারীতি বাজার সেরে পান কিনে রহিমচাচার সঙ্গে যেচে কথা বলতে গেলেন ।

-- ও রহিমচাচা । ও রকম পাকা সিঙ্গাপুরী আনারস আবার কবে নিয়ে আসছ ? নিয়ে এলে আমার জন্য রেখে দিও কিন্তু । বড় ভাল ছিল তোমার সেদিনের আনারস দু'টো । যেমন সুগন্ধ তেমনি মিষ্টি ছিল তোমার আনারস দু'টো ।

রহিমচাচা চক্ষু ছানা বড়া করে শশী ভট্চাজের কথা শুনছিল । হঠাৎ শশীবাবু যখন প্রশ্ন করলেন ও চাচা তুমি অমন হাঁ করে কি দেখছ বল দেখি।

রহিমচাচা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল -- 'না গো ভট্চাজ মশাই এমনি দেখছিলাম আপনাকে। রহিমচাচা কিন্তু মনের কথা মনেই চেপে রাখল । ভেঙ্গে বলল না সে এতক্ষণ হাঁ করে কি দেখছিল ।

শশী ভট্চাজ বললেন উঁহু এমনি নয় । নিশ্চয়ই তুমি অন্য কিছু ভাবছিলে । ব্যাপারটা একটু খুলে বল দেখি ।

শেষ পর্য্যন্ত ভট্চাজ মশাইয়ের পীড়াপীড়িতে চাচা বলল অপরাধ নেবেন না ঠাকুর মশাই । আমার বাগানেই ওই আনারস দু'টো হয়েছিল । তবে--

তবে কি ? শশীবাবু প্রশ্ন করলেন ।

তবে সেদিন দু'টো গোখরো সাপ ঢুকে পড়েছিল আমার আনারস বনে। আমি তাড়া করতে একটা সাপ তো ছোবল মারতে ছুটে এসেছিল । তবে ছোবলটা গিয়ে পড়েছিল একটা আনারসের গায়ে । কি জানি সেই আনারসে

বিষ ঢুকেছিল কিনা। আব ওই আনারস দু'টোই আপনি নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনাদের কিছু হয়নি তো ঠাকুরমশাই ?

ঠিক এরপরই শশী ভট্‌চাজের মাথাটা ঘুরে যায়। চোখ কপালে উঠে যায়। কাঁপুনি হতে থাকে। তার হাতে ধরা বাজার-হাট সব ছড়িয়ে পড়ে। তিনি পড়ে যান। জ্ঞান হারান। সে জ্ঞান আর ফেরান যায়নি বহু চেষ্টা করেও।

শেষ পর্য্যন্ত শশী ভট্‌চাজের দেহটা সবাই মিলে উত্তরপাড়া হাসপাতালের আউটডোরে পৌঁছে দিয়েছিল।

রহিমচাচাও সঙ্গে গিয়েছিল।

হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা শশী ভট্‌চাজের জ্ঞান ফেরাতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন নি। ডাক্তারদের মতে ওনার সেরিব্রাল ষ্ট্রোক হয়েছিল। আর তাতেই উনি মারা গেছেন।

কিন্তু রহিমচাচার প্রশ্ন ভট্‌চাজ মশাইয়ের মৃত্যু কি বিষাক্ত আনারস খেয়েই হয়েছিল না সাপে কাটা আনারসের গল্প শুনে হয়েছিল। কোনটা ঠিক, কে বলবে ?

রহিমচাচার খেদ হায় আল্লা ও গল্প কেন শোনাতে গেলাম ঠাকুর মশাইকে। হায় আল্লা ঠাকুরমশাই কি তবে সত্যিই মারা গেলেন। এখন কি হবে উপায়। মা মনসার সেই গামছাখানাও তো সঙ্গে নেই আজ। আনতে যেতে হবে চণ্ডীতলায়।

ঠাকুরমশাইয়ের দেহ পড়ে রইল হাসপাতালের বাইরের বারান্দায়। রহিমচাচা ছুটল রিক্সা করে চণ্ডীতলা অভিমুখে মা মনসার সেই পূত গামছা আনতে।

রহিমচাচার বুকটা কেবলই ঢিপ-ঢিপ করছিল। হায় হায় এ আমি কি করলাম। মনে মনে বলে জয় মা মনসা। একটু সময় দে মা। তোর আশীর্বাদী গামছাখানা এনে একবার বুলিয়ে দিতে সময় দে মা।

রহিমচাচা তারপর সত্যিই তার সেই গামছা নিয়ে এসে হাজির। কিন্তু শশী ভট্‌চাজের বডি তখন গঙ্গার ঘাটে দাহের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঠাকুর মশাইয়ের আত্মীয়-স্বজন সবাই শ্মশানঘাটে গিয়ে

উপস্থিত সৎকারের জন্য ।

রহিমচাচা আবার ছুটল রিক্সা করে গঙ্গার ঘাটে । দেখতে পেল চাপা দেওয়া ঠাকুরমশাইয়ের সেই ডেড্ বডি । যা তখনও পড়ে আছে ।

রহিমচাচা গঙ্গার ঘাটে নেমে সেই পুতঃ গামছাখানা ভিজিয়ে এনে ঠাকুরমশাইয়ের ছেলে ও আত্মীয়-স্বজনকে কাতরভাবে অনুরোধ কবল -- বাবুগো তোমরা ঠাকুরমশাইয়ের মুখখানা একবারটির জন্য খুলে দাও । আমি ওনার মুখে মা মনসার আশীর্বাদী গামছার এক ফোঁটা জল দেব । আমার মন বলছে ঠাকুর বেঁচে উঠবেন । দোহাই তোমাদের । বাবুগো একটু দয়া কর তোমরা ।

ক্রন্দনরত শশীবাবুর স্ত্রী এলোকেশীদেবী এগিয়ে এসে নিজেই খুলে দিলেন চাদর চাপা দেওয়া শশীবাবুর মুখখানা ।

হাঁ হাঁ করে উঠল সবাই । বড় ছেলে, ছোট ছেলে, মেয়ে জামাই সবাই ছুটে এসে বলে কর কি কর কি ! তুমি জাতে মুসলমান, আমাদের মৃত বাবার মুখে জল দেবে । ছিঃ ছিঃ একি কাণ্ডকারখানা । মা তুমি একি করলে বলতো ।

এলোকেশীদেবী কারও কথাই শুনলেন না । রহিমচাচাকে বললেন এসো বাবা, তুমি জল দাও ওনার মুখে । আমার একটুও আপত্তি নেই ।

ভরসা পেয়ে রহিমচাচা এগিয়ে এসে সেই পুতঃ গামছাখানা নিঙড়ে দু ফোঁটা জল বার করে মৃত শশী ভট্চাজের মুখে দিল ।

ওদিকে চুল্লীর লোকজন এসে তাগিদ দিল । বলল কই তেল, ঘি সব মাখান হয়েছে বডিতে । বডি ছেড়ে দিন । আর ডেথ সার্টিফিকেটখানা অফিসে জমা দিন ।

এলোকেশীদেবী বললেন একটু দেরী করতে হবে বাবা । আমাদের আর একটু সময় দাও ।

সবাই এরপর অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শশীবাবুর মুখের দিকে । ওদিকে মেয়েরা কাঁদছে ।

এদিকে মনে হল শশীবাবুর চোখের পাতা দু'টো যেন একটু নড়ে উঠল ।

একটু পরেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার শব্দও যেন শোনা গেল । তখনও

সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে শশীবাবুর মুখের দিকে। তারপর হঠাৎই সবাই এক বাক্যে বলে উঠল ওইতো উনি চোখ মেলেছেন। এই তো বাবার হাতে ধাত পড়ছে।

আনন্দাশ্রুর বন্যা বয়ে গেল মুহূর্তে।

শশীবাবু সত্যিই এরপর উঠে বসলেন।

নতুন করে স্থানীয় ডাক্তার এলো। বললেন মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছিল। এখন চিন্তার কোন কারণ নেই। ওনাকে আপনারা স্বচ্ছন্দে বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন। জানি না কেমন করে হাসপাতালের ডাক্তাররা ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছিল।

রহিমচাচা চিৎকার করে বলে উঠল জয় মা মনসার জয়। জয় বাবা মাণিক পীরের জয়। জয় খোদা তালা আল্লার জয়। এরপর রহিমচাচা ঠাকুরমশাইয়ের পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করল। শশী ভট্‌চাজ রহিমচাচাকে কাছে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বৈতালিক মারা গেল

একটা লোক চায়ের দোকানে বসে ভাঁড়ে করে চা খাচ্ছিল ।

অপর চারটে ছেলে এসে লোকটার পাশে বসল ।

প্রথম লোকটা দোকানীকে বলল -- আরও চারটে চা ।

প্রথম লোকটার নাম -- গোপেন রায় । মস্ত বড়ঘরের ছেলে । এক ভাই নাম করা আর্টিষ্ট -- কামিনী রায় ।

গোপেন রায়ের বাবা ছিলেন একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। ঠাকুরদা ছিলেন একজন প্রখ্যাত জজ ।

অথচ গোপেন রায় সে তুলনায় কিছুই না । একজন শিক্ষিত বেকার মাত্র । এম,এ, জার্নালিষ্ট এই পর্য্যন্ত যা যোগ্যতা । রাজা রামমোহন সরণীতে বাড়ী । বাপের অগাধ সম্পত্তি । কিন্তু হলে কি হবে গোপেন রায়ের বাবা ছেলেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বলে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছেন । বলে দিয়েছেন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবেই যেন সম্পত্তির ভাগ চাইতে আসে নইলে নয় ।

গোপেন রায় ছিলেন ভীষণ খেয়ালী মানুষ । ভীষণ একটা বদ রোগও ছিল । ছুঁচিবাই রোগ । যেটা সাধারণতঃ ছেলেদের হয় না মেয়েদের হয় । টাকা পয়সা নোট ইত্যাদি যখনই কিছু হাতে আসত গোপেন রায় সেগুলোকে ভাল করে জলে ধুয়ে তবেই ব্যবহার করত। আবার ট্রেন বাস থেকে নেমেই আগে গিয়ে ট্যাপ ওয়াটারে নিজের হাতটা ভাল করে ধুয়ে নিত।

এই ছেলেগুলো সেদিন একটা চায়ের দোকানে বসে গজল্লা করছিল ।

দেশটার আর কিছু হবে না জানিস । চারিদিকে শুধু অরাজকতা । বৃটিশ চলে গেল বটে তবে এখন স্বদেশী নেতাগুলোর রমরমা । ওরাই এখন সব লুটেপুটে খাচ্ছে । শুধু পাওয়ারটা মাত্র হস্তান্তরিত হয়েছে জানিস। আর কিস্‌সু না ।

গোপেন রায় একটু দম নিয়ে আবার শুরু করল । এখন আবার প্রমোটার নামধারী একদল ব্যবসায়ী মাঠে নেমেছে । লোকের মাথায় টুপি

পরিয়ে কেবল তলার পব তলা বাড়ী তুলে দিচ্ছে। ২ কাঠা জমিতে ১২টা ফ্ল্যাট। ৫ কাঠা জমিতে ২৫টা ফ্ল্যাট। কিনছেনও তো মানুষ ওই সব অপলকা ফ্ল্যাটবাড়ী। ভাবি মানুষ অত টাকা পাচ্ছে কোথা থেকে। House Building Loan? HDFC -র লোন। সে আর ক'টা লোক পায়। সবই কালো টাকার বিজনেস বুঝলি ?

আর সেকালের মত যৌথ পরিবারও নেই। শুধু দশ ফুট বাই দশ ফুট বা বিশ ফুট একটা ফ্ল্যাট। তাতে তুমি আর আমি। আর বেশী হলে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে, ব্যাস। ওসব বুড়ো বাবা মা ভাই বোনদের কথা -- ফুঃ। বুড়ো-বুড়িগুলো কেন যে এতদিন ধরে বাঁচে কে জানে। আসলে দু'টো পেটের অন্ন সংস্থান করতে গিয়ে মানুষ হিমসিম খাচ্ছে -- তাতে আবার বাবা-মা-ভাইবোনের সংকুলান। কোথা থেকে হবে শুনি ? তার থেকে মিলিটারীতে যোগ দিয়ে চলে যাওয়াই ভাল, কোন পিছটান নেই।

একটু দম নিয়ে গোপেন রায় সিগারেটটায় শেষ টানটা দিয়ে বলতে লাগল -- তারপর যে রেটে পপুলেশন বাড়ছে, উঃ ভাবা যায় না। এখনই একশ কোটি পেরিয়ে গেছে।

তোরা ওইসব পরীক্ষার ফলগুলোর দিকে তাকা দেখবি লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে বেরিয়ে আসছে। হাজার হাজার ছেলে মেয়ে পাশ করে বেরিয়ে এসে বেকারিত্বের মেন ষ্ট্রীম-এ মিশে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় অত চাকরী ?

পশ্চিমবঙ্গের সব কল কারখানার হাল তো কারও অজানা নয়। সেখানে চাকরী নেই প্রাইভেট ফার্মেও তাই। আর সরকারী চাকরী সে তো লটারী পাওয়ার সামিল। কাজেই ছেলেগুলো খাবে কি ? চুরি ডাকাতি করবে না তো কি করবে। ইয়ং জেনারেশন-এর দফা শেষ। সবাই এখন চোখে সরষে ফুল দেখছে।

বাপ বুড়ো হয়েছে। হয়ত আর দু একটা বছর চাকরী আছে। তাতে সংসারটা যা হোক করে এখনও হয়ত চলে যাচ্ছে, কিন্তু বাপের চাকরী গেলে ওই দশ হাজার টাকাটার সংকুলানটা হবে কোথা থেকে ? তাই তো আজ সবাই ফুটপাতে বসে পড়েছে। হকার সেজে এটা সেটা বিক্রীবাটা

করছে ফুটপাত দখল করে। দু'দিন বাদে আবার ওই ফুটপাতও জুটবে না। কারণ আগে যারা বসে পড়েছে সাইকেল রিপেয়ারিং-এর দোকান করে নয়ত বা আলু, পটল, পেঁয়াজ, সব্জী নিয়ে সে তো তার জায়গা ছাড়বে না। কাজেই নতুন বেকারদের চাকরীও নেই ফুটপাতও নেই। অন্য জায়গায় বেপাড়ায় গিয়ে বসবে তারও উপায় নেই। কারণ সেখানে ক্ষমতাবান পার্টিকে প্রচুর প্রণামী দিতে হবে। সে সংস্থান তোমার নেই। কাজেই মধ্যবিত্ত মানুষের মাথায় হাত -- ভবিষ্যৎ শেষ।

গোপেন রায় বলতে থাকল -- না না আমি আর ভাবতে পারছি না। এর থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়াই ভাল। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ফালতু ছায়া যুদ্ধ না করে ভারত পাকিস্থানের রাষ্ট্রপ্রধানরা গোপনে একটা সমঝোতা করে লাগিয়ে দিক আনবিক যুদ্ধ। একটা কোলকাতা, একটা দিল্লীতে আর একটা মুম্বাইতে পড়ুক ব্যস। এতেই হবে। বর্তমান জনসংখ্যা একদিনে অর্দ্ধেক হয়ে যাবে। যারা বেঁচে বর্ত্তে থাকবে তারা আবার ভিয়েৎনামের মত করে নতুন করে বেঁচে উঠবে। খেতখামারে কাজ পাবে। নতুন করে ঘরবাড়ী তৈরী হবে। মানুষ দুটি খেতে পাবে আর পাবে শান্তি।

পল্লব চৌধুরী বলে ছেলেটা বলে বসল -- গোপেনদা এতক্ষণ তুমি যা বললে এটা কি একটা পেপারে ছাপিয়ে দেব তোমার নাম করে। খুব ভাল এডিটোরিয়াল হয়ে যাবে। বলতো চেষ্টা করে দেখতে পারি।

-- কি বললি। আমার ভাষণটা ছাপিয়ে দিবি ? ব্রেভো। তা হলে আমার ভাষণটা ভালই হয়েছে বলছিস ?

পল্লব বলল -- সত্যিই ভাল হয়েছে। আমার ভীষণ মনে ধরেছে। বললে আমি এখনি সবটা লিখে তোমাকে দেখাতে পারি। তাই তো বলছি গোপেনদা আমাদের জন্য এবার একটু ভাবো। এভাবে চায়ের দোকানে চা খেয়ে আড্ডা মেরে আর দু'টো বারোয়ারী দুর্গাপূজো কালীপূজো করে কতদিন চলবে আমাদের ?

পল্লব আরও বলল -- আমারও একটা প্রোপোজাল ছিল।

গোপেন রায় বলল -- কি রকম শুনি।

পল্লব বলল -- তোমার কথা মত আমরা সবাই শিক্ষিত বেকার। চুরি

ডাকাতি করতে পারব না। ছোট কাজও করতে পারব না। তবে একটা কাগজ তো বার করতে পারি। যাতে তোমার লেখা থাকবে আমাদের লেখা থাকবে -- বেকারীত্ব দূরীকরণের সমস্যার কথা থাকবে, রাজনীতি তো থাকবেই আর থাকবে তোমার আমার সাধের কবিতা ছড়ারগুচ্ছ। ছোটদের জন্য মজাদার গল্প। কমিক্স কেমন হবে ভাবতো ?

গোপেন রায় সব শুনে আবারও বলল -- ব্রেভো। তবে তাই হোক। তোর দিশারী মেনে নিলাম। তাহলে একটা কাগজ বার করতে হবে। ওসব বাজারী কাগজে নয়। তাহ'লে সবাই কাজে লেগে যাও।

পঞ্চসাথী সমস্বরে বলে উঠল -- হুর্‌রে।

অমল, রাজু, আকাশ এতক্ষণ সব শুনছিল। ওরা আরও একবার চিৎকার করে বলে উঠল -- গোপেন রায় জিন্দাবাদ।

গোপেন রায় প্রশ্ন করল -- তাহলে কি নাম রাখা হবে কাগজটার। আচ্ছা 'সকাল' নামটা 'সাত সকাল' হ'লে কেমন হয় ?

সবাই মিলে আপত্তি করে উঠল -- না, না। ওসব 'সাত সকাল', 'সকাল' ভাল না। আমরা সারাদিন ধরে সংবাদ সংগ্রহ করে বিকেলে কাগজটা বের করব।

গোপেন রায় বলল তাহলে কাগজের নাম থাক 'বিকাল' বা 'বৈতালিক'।

এবার সবাই সমস্বরে বলে উঠল হ্যাঁ 'বৈতালিক' নামটাই থাক। বেশ নতুন নাম, মিষ্টি নাম। খুব লোক টানবে।

গোপেন রায় বলল তাহলে 'বৈতালিক' নামটাই রইল। কেমন ?

চায়ের দোকানে আবার পাঁচটা চায়ের অর্ডার দিয়ে গোপেন রায় বলল -- তাহলে আজ থেকে আমরা সবাই 'বৈতালিক'-এর স্টাফ্। কি তাইতো ?

রাজু, আকাশ, পল্লব, অমল সবাই একসঙ্গে বলে উঠল -- হ্যাঁ ঠিক তাই।

এলো চা।

চায়ের ভাঁড়ে তুফান তুলে সবাই বলল 'বৈতালিক' জিন্দাবাদ -- গোপেন রায় জিন্দাবাদ।

গোপেন রায় বলল আপাততঃ টাকার জন্য ভাবতে হবে না। আমার নিজের ক'টা KVP আছে। ওগুলো ভাঙ্গিয়েই কাজ শুরু করে দেব। তবে তোরাও ভাব। কে কতটা দিতে পারবি। মুখে বা লিখে অন্ততঃ সেটুকু জানা।

একটু থেমে গোপেন রায় বলল আমার জানাশোনা একটা প্রেস আছে। ফেলুদার প্রেস। তাকে ম্যানেজ করে আপাততঃ আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। চল আজই গিয়ে ফেলুদার সঙ্গে কথা বার্তাটা সেরে আসি।

যা ভাবা তাই কাজ।

পঞ্চরথী মিলে কাজে লেগে গেল।

ঠিক দশ দিনের মাথায় 'বৈতালিক' বেরিয়ে পড়ল। গোপেন রায় বলল আকাশ তুই যাবি কাগজ নিয়ে গড়িয়াহাটার মোড়ে। রাজু যাবে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে। পল্লব কলেজষ্ট্রীট আর অমল যাবে হাওড়াষ্টেশন চত্ত্বর। আর আমি যাব ধর্মতলার মোড়ে।

কাজ শুরু হয়ে গেল।

পঞ্চরথি রাস্তায় বেরিয়ে সত্যিই কাগজ ফেরি করতে লাগল।

-- এই যে দেখি একখানা 'বৈতালিক'। কি আছে এতে? বাঃ সুন্দর সুন্দর খবর আবার কবিতা ছড়া কত কি। আবার দেখছি বিজ্ঞাপনেরও কমতি নেই। কত দাম ভাই -- ?

দাম মাত্র এক টাকা। এই যে নিন। হ্যাঁ সম্পাদকীয়টা পড়ে দেখবেন। গোপেন রায়ের লেখা।

হিড়িক পড়ে গেল 'বৈতালিক' কেনার। ভালই বিক্রী হতে লাগল কাগজ। দিনের পর দিন।

আর গোপেন রায় এই কাগজ বিক্রীর ফাঁকে ফাঁকে রাধাবাজার, ধর্ম্মতলার এ দোকান সে দোকানে গিয়ে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে লাগল। গোপেন রায়ের বক্তব্য আপনাদের দোকানের ম্যাটারটা শুধু দিন। ছাপিয়ে দেব, পরে দাম দেবেন সময় মতো।

বিনা পয়সায় বিজ্ঞাপন। কে না চায়। আসতে লাগল বিজ্ঞাপন। পাত্র পাত্রীর কলমও ফাঁক গেল না।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে গোপেন রায় নিজের কাগজে পাত্রী চাই কলমে নিজের জন্য পাত্রীর সন্ধানে লিখল পাত্রী চাই। গায়ের রং শ্যামবর্ণ হলেও চলবে। তবে অন্ততঃ বি,এ, পাশ। রান্না-বান্নাও জানা চাই। যৌতুক নিঃস্প্রয়োজন।

জুটল সেই মত পাত্রী।

বিয়েও হয়ে গেল গোপেন রায়ের।

বিবাহিত জীবনের ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় বছরেই এক কন্যা সন্তানের প্রাপ্তিলাভ ঘটল।

কিন্তু মানুষভাবে এক আর ভগবানের ইচ্ছায় হয় আর এক। বছর পাঁচেকের মাথায় কাগজের চাহিদা মন্দা হোল। শেষ পর্য্যন্ত গোপেন রায়ের পৈতৃক সম্পত্তিতে হাত পড়ল। ফেলুদার প্রেসটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'বৈতালিক'ও বন্ধ হয়ে গেল।

পঞ্চরথীর আপ্রাণ চেষ্টাতেও 'বৈতালিক'-কে আর বাঁচান যাবে না ভেবে গোপেন রায় তার স্ত্রী ও কন্যাকে ফেলে কোথায় যেন চলে গেল।

'বৈতালিক'-এর অন্য সারথীরা অনেক চেষ্টা করেও গোপেন রায়ের আর সন্ধান যোগাড় করতে পারল না।

পঞ্চরথীর মনসমুদ্রে ঢেউ উঠেছিল অনেকগুলো। সবই ছোট ছোট ঢেউ। বড় ঢেউ হয়ে ভেঙ্গে পড়ার আগেই ছোট ঢেউ গুলো হঠাৎ আবার সমুদ্রে মিশিয়ে গেল।

'বৈতালিক' মারা গেল। ভিন্ন ভিন্ন কাগজে সংবাদটুকু শিরোনাম হয়ে সকলের নজর কাড়ল।

চলো কোথাও হারিয়ে যাই
(অনু গল্প)

১ম ব্যক্তি -- কি খবর, কেমন আছো ?

২য় ব্যক্তি -- ভালো । তুমি কেমন আছো ?

১ম ব্যক্তি -- ভালো ।

২য় ব্যক্তি -- আরে যাচ্ছ কোথা ? তুমি আমার স্কুলের বন্ধু এতদিন পরে দেখা, একটু বসেই যাও । -- তারপর শুধুই ভালো না খুব ভালো কোনটা ?

এবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ১ম ব্যক্তির বুক থেকে। রাস্তার একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ১ম ব্যক্তিটি বলল -- শুধু ভাল দিয়েই সারাটা তো ভাল ছিল ভাই ।

তুমি বলতে পার এই দুনিয়ায় কে ভাল আছে ? কেউ না ।

সবার বুকেই কত না ব্যথা ।

সবার মনে কত দুঃখ, জ্বালা । নয়ত বা ক্ষোভ, অনুশোচনা । যাকে ভাল আছ কিনা জিজ্ঞাসা করছ সে সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দেবে -- ভাল আছি। এই আমারই মত। আসলে সেই লোকটা হয়ত অসুখে ভুগছে, হয়ত তার নিজের হার্ট ট্রাবল রয়েছে, বুকে পেসমেকার, নয়ত লোকটা হাঁফানিতে কষ্ট পাচ্ছে নয়ত বা বাতে ভুগছে কিংবা দাঁতের যন্ত্রনা, বা অন্য কিছু মানসিক যন্ত্রনায় ভুগছে । তবু সবাই আমরা শটে সারি ভাল আছি বলে । আর তা নাহলেই তো তাকে নানান ফিরিস্তি দিতে হবে, কি হয়েছে তার । কি হবে এইসব বলে । যাকে দুঃখ যন্ত্রনার ফিরিস্তি দেবে সে কি তোমার আমার জ্বালা যন্ত্রনার কিছু সুরাহা করে দিতে পারবে ? -- পারবে না । তাই শুকনো ভাল আছি বলাটাই ভালো । কি তাই না ?

এই তো আমার ক্ষেত্রেই দেখ না । বাপ মারা গেল, মা মারা গেল, বউটা কোথায় চলে গেল । ছেলে দুটো মানুষ হল না, মনের মত হল না । ভাল চাকরী-বাকরী পেল না । দেশের অতবড় সম্পত্তি, জমি-জমা, পুকুর,

বাগান বাবার অবিমিশ্রকারিতায় সব নষ্ট হয়ে গেল । এখন শুধু শহরের বুকে একটা ইঁটকোঠা তৈরী করে আগলে বসে আছি । মরে না গিয়ে এখনও নিত্য জ্বালা ভোগ করছি । জানি আমি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে রায় বাড়ীর পুরোন ঐতিহ্যটুকু এক ফুঁয়ে নিভে যাবে । তবু যারই সঙ্গে দেখা হয় কেমন আছি জিজ্ঞাসা করলে বলি ভালই আছি । যাক এখন বল তুমি কেমন আছো, কবে রিটায়ার করলে ?

২য় ব্যক্তি এবার বলতে লাগল -- ঠিকই বলেছ তুমি । এ পৃথিবীতে ভগবান কাউকেই শান্তি দেয়নি । সাময়িক সংসার সুখ স্বাচ্ছন্দ দিয়েই আবার সব কেড়ে নেয় । মানুষকে ভিখিরি করে দেয় । মানুষ যা চায় তা পায় না । আর যা পায় তাতে মন ভরে না । এই তো আমি গায়ে গতরে খেটে কত পরিশ্রমটাই না করে অমন সুন্দর বিজনেসটা দাঁড় করালাম কিন্তু ছেলে না থাকায় জামাইয়ের অবিমিশ্রকারিতায় বিজনেসটা নষ্ট হয়ে গেল । তাই ভাবছি আর না । ব্যবসার শেষ পুঁজিটা সম্বল করে এবার কোথাও চলে যাব, হয়ত তীর্থে নয়ত কোন বৃদ্ধাশ্রমে ।

কোনটা যে করব তা ভেবে ঠিক করতে পারছি না বলেই রোজ এমনই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে চিন্তা করি । এখন মনে হয় এতদিন যা করেছি সব ভুল করেছি । যাকে যাকে বিশ্বাস করেছি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । সংসারের সবাই স্বার্থপর । যারা এখনও একটু-আধটু খাতির যত্ন করে তা শুধু নিজেদের স্বার্থেই করে । শুধু কখন মরব এই চিন্তায় ওরা মগ্ন । মুখে কিছু না বললেও ওদের লোক দেখানো কর্ত্তব্যবোধ থেকেই সব বোঝা যায় ।

তার চেয়ে বরং আমরা দুই বন্ধু সংসার থেকে বেরিয়ে চলো যাই কোথাও হারিয়ে যাই ।

চার কন্যার কাহিনী

গীতা, সীতা, করুণা ও এদের মা লাবণ্য ।

চার কন্যা ।

ওই চার কন্যারই বাস ছিল কোলকাতার নিষিদ্ধপল্লী সোনাগাছিতে।

চার কন্যার এক কন্যা গীতা মারা গেছে । আসলে সে আত্মহত্যা করেছিল । গীতার বয়স হয়েছিল মাত্র সতের । দেখতে শুনতে খুবই ভাল ছিল । ফর্সা । গায়ের গড়ন দেখে মনে হোত চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মেয়ে।

গীতা সীতা আর করুণার মা লাবণ্য বেশ কিছুদিন ধরে সোনাগাছিতে ভদ্রপল্লীতে ঝি-এর কাজ করত। বাসন মাজত দু-তিন বাড়ীতে। আর রাত্রে যৌন কর্মী হিসাবে বুভুক্ষু খদ্দেরদের যৌন ক্ষুধা মেটাত।

এমনি করেই দিন কাটছিল গীতা, সীতা ও করুণার মা লাবণ্যের ।

করুণার মা লাবণ্যর মনটা ছিল খুবই নরম । তবে মনে বড় দুঃখ । প্রায়ই তার ছোট বেলার কথা মনে পড়ত। মনে পড়ত তার বাবা মায়ের কথা ।

লাবণ্য যখন ক্লাস নাইনে পড়ছিল তখন পাড়ার এক উঠতি বয়সী দাদা তাকে গোপনে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রেম নিবেদন করে এবং পরে তাকে নষ্ট করে দেয় ।

চার মাস কাটতে না কাটতেই লাবণ্যর মাঝে মধ্যেই বমি হতে লাগল । লাবণ্যর মা পরে লাবণ্যকে ডাক্তার দেখাল । ডাক্তার বলল লাবণ্য অন্তঃসত্ত্বা।

লাবণ্যর বাবা মায়ের মাথায় হাত।

কি করে ওই অবস্থায় ।

তা অনেক চেষ্টা করে লাবণ্যর মা তার গ্রামের এক পিসতুতো ভাইকে সব কথা খুলে বলল । বলল যেমন করে পারিস এর একটা বিয়ের ব্যবস্থা কর । আমার অবস্থাটা তো তুই জানিস । দিন আনি দিন খাই । মিনসেরও তেমন রোজগার নেই । তবে ওর বিয়ের জন্য হাজার দু'য়েক টাকা জমিয়েছি, আর দু'গাছা ব্রোঞ্জের চুড়ি গড়িয়ে রেখেছি । তুই, বাবা এগুলো দিয়ে যেমন

করে পারিস দায় উদ্ধার কর ।

লাবণ্যর পিসতুতো ভাই শেতল ভাল মওকা পেল ।

একদিন রাতে শেতল লাবণ্যকে নিয়ে রওনা দিল । বলল ছেলে কোলকাতার এক হোটেলে কাজ করে । আমার চেনা-জানা । আমিই নিয়ে গিয়ে ওদের রেজেষ্ট্রী বিয়ে করিয়ে দেব । তোমরা ভেব না । তা শেতল তো লাবণ্যকে নিয়ে গেলই । কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় রাতটা লাবণ্যকে তার নিজের বাড়ীতে রেখে উপরিসুখটা ভোগ করে নিতে ভুলল না ।

তারপর তৃতীয় দিন রাতে লাবণ্যকে নিয়ে কোলকাতা নিষিদ্ধপল্লী সোনাগাছিতে এনে শেতলের জানাশোনা এক মাসির কাছে ওকে পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রী করে দিল ।

লাবণ্য অল্প বিস্তর লেখাপড়া জানলেও তার ওই অবস্থার পর আর লোকালয়ে গিয়ে মুখ দেখানো যাবে না ভেবেই সোনাগাছির মাসীর বাড়ীতেই নিজেকে সঁপে দিল । বরাতে যা আছে তা হবেই । তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই বুঝতে পারল ।

মাসীর সদ্ ইচ্ছায় লাবণ্যর প্রথম সন্তান রক্ষা পেল ।

যথা সময়ে জন্ম নিল গীতা ।

গীতা বড় হয়ে উঠতে লাগল ।

লাবণ্যও মাসীর মর্জি মাফিক তার যথা কর্তব্য সম্পাদন করে দিতে প্রতি রাত্রে সঙ্গ দিতে লাগল নারী মাংসলোলুপ মানুষ পশুগুলোকে ।

এদিকে গীতার যখন পাঁচ বছর বয়স তারই মাঝে জন্ম নিল সীতা । তার দু'বছর বাদেই এলো করুণা ।

মাসীর খোয়ার আরম্ভ হোল ।

এতগুলো পেট চলবে কি করে । লাবণ্যর যৌবনের জৌলুসে ঢল নেমেছে ।

লাবণ্যও বুঝতে পারছিল তার শরীরের শিথিলতার কথা । তাই রোজ রাতে আর ওভার টাইম খাটতে পারত না একটার বেশী । আর সে কারণেই সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল সে এবার থেকে ঝিগিরি করবে দিনে ।

লাবণ্য মাসীকে বলে আশপাশের ভদ্র পল্লীতে জুটিয়ে নিল বাসন মাজার

কাজ । ঝি-এর কাজ । যেহেতু এটা দিনের রোজগার তাই এ টাকাতে মাসীর কোন হক দাবী ছিল না । তাই লাবণ্য অতি কষ্টে কিছু কিছু টাকা জমিয়ে ফেলল ।

দিন যায়, রাত যায় ।

কিন্তু লাবণ্যর ভাবনা আর যায় না ।

দিনে দিনে তিন তিনটে মেয়ে ক্রমে বড় হয়ে উঠতে লাগল চোখের সামনে । তাই ভয় হয় লাবণ্যর । আর একটু ডাগোর হলেই তো মাসী এদেরকে যৌনকর্মী হিসাবে কাজে জুড়ে দেবে । কিন্তু এরা যদি একটু লেখাপড়া শেখে তবে কি এত বড় শহরে এদের একটু ভালো সদ্‌গতি হবে না । একটু ভালো চাকরী বা রান্না-বান্নার কাজ ।

তাই মন ঠিক করে ফেলে লাবণ্য । মেয়েগুলোকে লেখাপড়া শেখাতেই হবে ।

একদিন তার কাজের বাড়ীর কর্ত্তাকে বলে বসল সব কথা । কর্ত্তাবাবু মন দিয়ে সব শুনে বললেন ঠিক আছে আমার জানাশোনা এক মাষ্টারমশাই আছেন এ পাড়ায় । রিটায়ার্ড হেড মাষ্টার ।

একলা থাকেন তবে বসে কাটান না ।

এ পাড়ায় তাঁর নিজের তৈরী একটা পাঠশালা আছে । তোমাদের নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েরা ওখানে গিয়ে ওনার কাছে লেখাপড়া শেখে, হাতের কাজ শেখে ।

লোকে কি বলে তাতে উনি কান দেন না। ভদ্রলোকের নাম সদাশিববাবু। সদাশিব রায় । খুব ভালো লোক। তোমার তিন মেয়েকে ওখানেই ভর্ত্তি করিয়ে দেব বলে কয়ে কেমন । তুমি ভেব না ।

সত্যি সত্যিই এরপর গীতা, সীতা আর করুণা সদাশিববাবুর পাঠশালাতে ঠাঁই পেল ।

সদাশিববাবু ছিলেন নিঃসন্তান, বিপত্নীক। সোনাডাঙ্গা গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি । রিটায়ারমেন্টের ঠিক এক বছর আগেই তিনি বিপত্নীক হন ।

তারপর আর কি করবেন ।

চাকরী করতে আর তার ভালো লাগছিল না। বাড়ীতে বসে দিন রাত টিভির দিকে চোখ রেখেও শান্তি পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্য্যন্ত ভাবলেন -- ছ'টা মাস তো ছুটিই পাওনা আছে। যাই বরং ছুটি কাটিয়ে আসি। দেশ বিদেশ ও ঘোরা হবে তারপর বৃদ্ধ বয়সে তীর্থ ভ্রমণও হয়ে যাবে।

যা ভাবা তাই কাজ।

তা সত্যিই সদাশিববাবু ছুটি কাটাতে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

আর ফিরে এসে ভলিউন্টারী রিটারমেন্ট নিয়ে বসলেন।

এদিকে তখন দেশ জুড়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জোয়ার এসেছে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে সর্বত্র। এককালে ছাত্র পড়ান যার কাজ ছিল সেই ভদ্রলোক কি চুপ করে বসে থাকতে পারেন।

বিচিত্র এক বাসনা জেগে বসল তার মনে। ঐ সব অচ্ছ্যুত নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েগুলোকে স্বাক্ষর করতে হবে। ওদেরকে ঐ কুপথ থেকে সরিয়ে এনে তাদেরকে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। অবশ্য তার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ ও পয়সা চাই। স্ত্রী মনোরমা যদি বেঁচে থাকত তবে নিশ্চয়ই তাকে এ বিষয়ে মদত দিত। যাই হোক চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। এই ভেবে সদাশিববাবু কাজে নেমে পড়লেন।

তারই বাইরের ঘরের বারান্দায় বসালেন স্বাক্ষরতা কাম স্বনির্ভরতার একটি সাইনবোর্ড। কেবলমাত্র নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েদের জন্য। তারপর একা পেরে উঠবেন না ভেবে সমমনভাবাপন্ন আরো দু'জনকে সঙ্গে নিলেন। তারাও রিটায়ার্ড।

দেখতে দেখতে ভর্ত্তি হয়ে গেল সদাশিববাবুর পাঠশালা। এখানেই পড়তে এল গীতা, সীতা আর করুণা।

কিন্তু হলে কি হবে।

লাবণ্যর এহেন সব কাজকর্ম মাসী লক্ষ্মী বাঈ-এর মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে বিলেত পাঠাবার স্বপ্ন দেখছে নাকি মাগী।

কত ঢংই না দেখব। দেখব দেখব বিদ্যে শিখিয়ে তুই কোন সগ্‌গে পাঠাস তোর মেয়েদের। আমার হয়েছে যত জ্বালা। কোন দিকটা সামলাই। পট পট করে তিন তিনটে বেটী বিইয়ে আমাকে উদ্ধার করেছে। আবার

মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ঢং হচ্ছে। আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না।

লক্ষ্মীবাঈ ভাবতে লাগল আরো অনেক কিছু। একজনকে পুষতে গিয়ে এখন চার জনকে ভাত কাপড়ে পুষতে হচ্ছে। কবে ওনার তিন মূর্ত্তিমান রম্ভারা আবার এপথে নেমে রোজগার করবে তারই আশায় বসে থাকা। নইলে কবে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিতেম। আমিও দেখব তোর মেয়েরা কেমনে পার পায় আমার হাত থেকে।

যাইহোক এমনি ভাবেই দিন কাটছিল।

লাবণ্যর মেয়েরা সদাশিব রায়ের পাঠশালায় পড়তে যায়। পড়া সেরে বাড়ী আসে। অবশ্য এই মাসীর বাড়ীতেই। যেখানে রাতের বেলা নিশাচর মানুষগুলো স্ফূর্ত্তি করে লাল পানি খায় মাতলামি করে আরও কিছু করে।

মাসী মাঝে মাঝেই গীতাকে কানে কানে কিছু কথা বলতে চেষ্টা করে এমনকি সীতাকেও।

গীতা আর সীতা তখনও ফ্রক ছাড়েনি। ওরা মাসীর কু-মতলবে কান দেয়না। সন্ধ্যে হলেই তারা তিন বোন নিজেদের ঘরে ঢুকে খিল এঁটে পড়াশোনা করে। হাতের কাজ করে। কেউ উল বোনে। করুণা অতটুকু মেয়ে হলে কি হবে। সে সদাশিববাবুর কর্মশালা থেকে ধূপকাঠি তৈরীর ব্যাপারটা শিখে এসেছে। বাড়ীতে বসে একাই মাসে দু'একশ টাকার মাল তৈরী করে। আর সীতা কেবলই পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

মাসীর আর সহ্য হয়না।

গীতা সীতাকে কাজে নামাতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা চুরির একটা অপবাদ দিয়ে থানা পুলিশ করে বসল।

পুলিশ, মাসীর অভিসন্ধির কথা বুঝতে পেরে কি জানি কি ভেবে সে যাত্রা গীতা সীতাকে হাজত বাস থেকে রেহাই দিল। তবে একটা সর্ত সাপেক্ষে। মাঝে মাঝে ডাকলেই থানায় এসে হাজিরা দিয়ে যেতে হবে।

গীতা আর সীতা বাড়ী ফিরে আসতেই লক্ষ্মীবাঈ তো অগ্নিমূর্তিধারণ করল। একটা পোড়া কাঠ এনে মারতে লাগল ওদের দু'জনকে। বের বলছি হতচ্ছাড়ির দল। বের বলছি। রূপ দেখে আজ তোদের পুলিশ

ছেড়েছে কাল ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি ছাড়ছি না। আমার ডেরা থেকে তোরা সবাই বেরিয়ে যা। তোদের আর মুখ দেখতে চাই না। বলি আমার সোনার বালা দু'গাছা এমনি অদৃশ্য হয়ে গেল। তোরা কিছুই জানিস না। তোদের মা মাগীকে পাঁচ হাজার টাকায় কিনেছি, এখন যে বিশ হাজার টাকা আমার বেরিয়ে যায়।

লজ্জায় ক্ষোভে অপমান সহ্য করতে না পেরে লাবণ্য তার তিন বেটিকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন পথে বেরিয়ে পড়ল লক্ষ্মীবাঈ-এর ডেরা ছেড়ে।

পথে বেরিয়ে লাবণ্য ভাবল একবার সদাশিববাবুকে সব কথা খুলে বলি তিনি যদি একটু ঠাঁই দেন।

সদাশিব রায় সব কথা শুনে লাবণ্য আর তিন মেয়েকে তার পাঠশালার পাশের একটা ঘরে ঠাঁই দিলেন। সর্তএকটাই আর লক্ষ্মী মাসীর বাড়ীতে যাওয়া চলবে না। আর এখানে লেখাপড়া তো শিখতেই হবেই। এখানকার কর্মশালার কাজকর্মও শিখতে হবে, কাজকর্ম করতে হবে। কাঁথা সেলাই রেডিমেড জামা, ব্লাউজ, উলের সোয়েটার, মাফলার, ধূপকাঠি তৈরী, টিপ তৈরী পছন্দ মাফিক কাজ কিছু করতেই হবে। অবশ্য কাজ শিখলে হাতে নগদও কিছু করে পাবে। এখন তোমাদের ইচ্ছা।

ওরা সবাই এমন প্রস্তাব পেয়ে যেন বর্তে গেল। সদাশিব বাবুর পাঠশালাও চলতে লাগল রমরমিয়ে।

সোনাগাছির নিষিদ্ধপল্লীর আরও কত মেয়ে আসে সদাশিববাবুর পাঠশালায় পড়তে কাজ শিখতে।

হাতের কাজে পোক্ত হলে পরে সদাশিববাবু প্রত্যেককেই কিছু কিছু হাত খরচও দিতে লাগলেন এবং টাকা দেবার সময় সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন মনে আছে তো তোমরা স্বনির্ভর হয়ে উঠলে পরে আর কেউই এই খারাপ পথে পা বাড়াবে না। যদি জানতে পারি ফের ও পথে গিয়ে ভুল করেছ তবে সেদিন থেকেই এ পাঠশালার দরজা তোমাদের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। মনে থাকবে তো ?

সেদিন বড় ছোট সবাই একবাক্যে বলেছিল মনে থাকবে স্যার।

এই একটাই সান্ত্বনা নিয়ে সদাশিববাবু বেঁচে রইলেন। সমাজের ওই

সব অধঃপতিত মেয়েগুলোকে সত্যিই নরক থেকে উদ্ধার করতে হবে ।

কি যে সখ ওনার উনিই জানেন ।

রিটায়ার করে কত লোক তো তীর্থ ধর্ম করে বেড়ায় । বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে আরামে দিন কাটায় আর সদাশিববাবুর এ কি বিচিত্র সখ । নিষিদ্ধপল্লীর পিতৃপরিচয়হীন মেয়েগুলোকে মানুষ করে দেশের দশের গৌরব বাড়িয়ে তুলবেন ।

সরকারী কোন খেতাব মনে মনে প্রত্যাশা করে বসে আছেন কিনা জানি না । তবে এ হেন কাজে ব্যস্ত আছেন এমন একটা লোক বা একথা সরকারের কানে বা কোন কাগজে, এ পর্য্যন্ত খবর হিসাবে বেরিয়েছে কিনা কারো জানা নেই ।

যাই হোক চার কন্যা নিয়ে গল্প হচ্ছিল । তা লাবণ্যর জীবনের তো মোড় ঘুরল শেষ পর্য্যন্ত সে এখন সদাশিববাবুর রান্না-বান্নাও করে দেয়, তার অসুখ বিসুখে সেবা শুশ্রুষা করে । সকাল-সন্ধ্যে বাড়ীর শিব পার্বতীর পূজা করতেও ভোলে না । দেখতে দেখতে মেয়েগুলো সব চোখের সামনে আরো বড় হয়ে উঠল ।

গীতা হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করল । সীতা ক্লাস নাইনে পড়ছে, আর করুণা ফাইভে ।

এমনি করেই আরো কিছুদিন কাটল ।

হঠাৎ বড় বাজারে কানাই বলাইয়ের দোকানে কাপড় কিনতে এসে লক্ষ্মীবাঈ (সেই মাসী) এদেরকে দেখে চিনতে পেরে বলল -- কে রে গীতা, সীতা আর করুণা না ? তারপর তোরা সব কেমন আছিস্ । কোথায় আছিস্?

-- ভালো আছি মাসীমা । তা তুমি কেমন আছো ?

-- তোদের মা লাবণ্যর খবর কি ?

-- মা ভালো আছে । গীতা বলল ।

লক্ষ্মীবাঈ বলল -- হ্যাঁ রে গীতা তোর একদিন একটু ফুরসত হবে আমার বাড়ী আসবার ।

-- কেন মাসীমা ?

-- আর বলিস কেন ? তোর বড় মেসো আমার নামে পুরোনো বাড়ী কিনে দিয়েছে। বলছে আর খেটে খেতে হবে না। উঠে গিয়ে ঐ বাড়ীতেই থাকো। আর যা বাড়ী ভাড়া পাব তাতেই নাকি আমার চলে যাবে। তা উইলটা আমার কাছেই আছে। সবে দিয়েছে। তবে ঠিক ঠিক কি লেখা আছে তা যদি একদিন এসে একটু পড়ে দিয়ে যেতিস তো খুব ভালো হোত।

সীতা গীতা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

তারপর গীতাই বলল -- তা বেশত আমি একদিন গিয়ে পড়ে দিয়ে আসব। একথা বলে ঢিপ করে লক্ষ্মীবাঈকে একটা প্রণাম করল।

-- আবার প্রণাম কেন মা ? আমি কি প্রণামের যুগ্যি। লক্ষ্মীবাঈ বলল।

গীতা বলল -- হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছি গো মাসী। তাই পেন্নামটা সেরে নিলাম।

-- বা ! বা ! বেশ। বেঁচে থাক, সুখে থাক। ভালো বর জুটুক এই আশীর্বাদ করি। তাহলে একদিন আসিস বাবু -- আজ চলি। লজ্জা করিসনে। ভয় নেই।

গীতা বলল লজ্জা বা ভয় করতে যাব কেন। ঠিক আছে আমি কাল বাদ পরশু বিকেলেই যাচ্ছি। তুমি চিন্তা কর না।

লক্ষ্মীবাঈ চলে গেল।

এরাও কানাই বলাইয়ের দোকান থেকে কেনা-কাটা সেরে বেরিয়ে পড়ল।

তারপর সেদিন শনিবার।

গীতা আর সীতা সদাশিববাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে সোনাগাছির সেই মাসীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

সীতা বলল দিদি তুই এবার যা। আমি ততক্ষণ এই পার্কেই রইলাম। এক্ষুনি চলে আসবি কিন্তু। ঠিক আছে বলে গীতা এগিয়ে গেল।

মাসী লক্ষ্মীবাঈ আগে থেকেই দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

গীতা ঘরে ঢুকতেই বলল -- ওমা কি সুন্দর দেখাচ্ছে রে আজ তোকে শাড়ী পরে। কত বড় হয়ে গেছিস। কালকের ফ্রক পরা মেয়ে আর

আজকের শাড়ী পরা মেয়েতে কত তফাৎ। বোস্ মা বোস্, একটু মিষ্টি মুখ কর আগে। এতদিন পরে মাসীর বাড়ী এলি। তারপর দলিলখানা এনে দেখাই তোকে।

গীতা মিষ্টি মুখ করল না। বলল না-না ওসব থাক। কই তুমি দাও দেখি তোমার কাগজখানা পড়ে দিই তাড়াতাড়ি।

লক্ষ্মীবাঈ-এর সব ব্যবস্থাই করা ছিল আগে থেকে। সে জানত তার খপ্পরে লাবণ্যর মেয়েকে আসতেই হবে। আসলে পাঁচ হাজার টাকাটা উঠলেও সুদের টাকা তো ওঠেনি। আজ সেই সুদের টাকাটা সুদে আসলে তুলতে হবে।

মাসী বলল বোস্ মা আমি পাশের ঘর থেকে দলিলটা আনি।

মাসী সেই যে গেল আর এলো না।

তবে মাসীর বদলে এল এক মাঝবয়সী লোক। বয়স পঞ্চাশ ঊর্দ্ধ হবে। ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত। এক মুখ হাসি হেসে গীতার কাছে এসেই গীতাকে জড়িয়ে ধরল এবং একবার ছেড়ে দিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। গীতা মতলব বুঝতে পেরে মাসী মাসী করে চিৎকার করল। ঘরের এ কোনে ও কোনে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। কাঁচ কড়ার তৈরী বড় বড় ফুলদানিগুলো লোকটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত একসময় হাঁফিয়ে পড়ল।

লোকটা গীতাকে মেঝে থেকে তুলে এনে বিছানায় ফেলল। গীতার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। বলল আমি কোলকাতার শেষ জমিদার সূর্যকান্ত চৌধুরী। আমার বাবার সমস্ত ধনসম্পদ এখনও যা আছে তাতে তোমার মত দশটা মেয়েকে পুষতে পারি, রাখতে পারি। যাক্ আর হাত পা ছোঁড়াছুড়ি করতে হবে না। ভালো মানুষের মত আমি যা চাই তাই দিয়ে দাও আর এই নাও তার কিস্মত। পুরো বাণ্ডিলটাই তোমাকে দিলাম। মাসীকে পরে যা দেবার দেব।

গীতার আর কিছু মনে নেই। অজ্ঞান অবস্থায় তার সতীত্বের কুমারীত্বের সবটুকুই যে চুরি হয়ে গেছে বুঝতে পারল জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল গীতা।

এখন কি করবে সে । এ মুখ দেখাবে কি করে সদাশিববাবুকে আর তার মা বোনকে।

ঘরের মধ্যে গীতা একা ।

ওপরে শিলিং পাখাটা ঘুরছে । আর একটা নাইট ল্যাম্প জ্বলছে ঘরে। ওদিকের টেবিলে কিছু খাবার দাবার চাপা আর এক গ্লাস জল ।

গীতা উঠে বসল । কোমরের সায়াটা তুলে নিয়ে শেষ বারের মত ভালো করে বেঁধে নিল, কোমর থেকে যাতে সহজে না খোলে ।

তারপর টেবিলে রাখা জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে জলটা খেয়ে নিল । পরে পরণের শাড়ীটা কুড়িয়ে নিয়ে পাক দিয়ে দড়ির মত করল। পাখার সুইচটা বন্ধ করে দিল । শাড়ীতে একটা ফাঁস বানাল । পরে টেবিলের পাশের চেয়ারটাকে টেনে এনে তার হাতলে দাঁড়িয়ে পাখার সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে নিজে ঝুলে পড়ল ।

সব শেষ হয়ে গেল গীতার ।

গীতার আস্তে দেরী হচ্ছে দেখে সীতা সব কথা মা লাবণ্যকে আর সদাশিববাবুকে বলল ।

সদাশিববাবু বড় বাজার পুলিশ ষ্টেশন থেকে পুলিশের দলবল নিয়ে হানা দিল লক্ষ্মীবাঈ-এর ডেরায় । রাত তখন দুটো ।

মিলল মাসীর ঘরে গীতার ঝুলন্ত লাশ আর একটা চিরকূট।

পাকড়াও হল লক্ষ্মীবাঈ আর সেই জমিদার নন্দন সূর্যকান্ত চৌধুরী ।

আর কি । এরপর কেঁদে ভাসাল লাবণ্য, সীতা আর করুণা । সদাশিববাবুর চোখ দিয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে লাগল অশ্রুধারা । তার সাধের স্বপ্ন বুঝি খান খান হতে চলেছে । হায় ভগবান একি করলে ।

এরপর সদাশিববাবু আর এগোবেন কিনা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। গীতা তো খুব ভালো মেয়ে ছিল, তার এমন হতে পারে এ যে ভাবাই যায় না। শুধু গীতা কেন এখন তার পাঠশালায় যারাই পড়ছে, কাজ শিখছে তারা ওইসব যৌনকর্মী মায়েদের মেয়ে হলেও এরা এখন সৎ পথেই চলতে চায় ।

সীতা এসে সদাশিববাবুকে সান্ত্বনা দেয় ।

-- আপনি ভেঙ্গে পড়বেন না মাষ্টারমশাই । আমরা তাহলে দাঁড়াব

কোথায়। আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা সবাই ভালো থাকতে চাই ভালোভাবে বাঁচতে চাই। নিন উঠুন আপনি দু'দিন জলস্পর্শ করেননি একটু কিছু মুখে দিন। এখন কি খাবেন বলুন চা না লেবুর জল। দুই-ই এনেছি যেটা পছন্দ নিন ধরুন।

সদাশিববাবু সীতার হাত থেকে লেবু জলের গ্লাসটা নিয়ে সীতার মাথায় হাত দিয়ে বললেন তোদের জন্যই তো আমার বেঁচে থাকা মা। তবে কথা দে তোরা যেন গীতার মত ভুল করিস নে, কারু কাছে ধরা দিবি না।

-- কথা দিলাম। উপস্থিত সব ক'জনে সমস্বরে বলে উঠল।

আস্তে আস্তে সদাশিববাবু মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তার সাধের পাঠশালা কাম কর্মশালা আবার জমে উঠল পিতৃ সম্পর্কহীন নারী কণ্ঠের কলকাকলিতে, ক্রিয়া কর্মে।

দেখতে দেখতে করুণা চোদ্দয় পা দিল। ফ্রক পরা করুণা ডানপিঠে মেয়ে। কোমর দুলিয়ে বই খাতা নিয়ে হেঁটেই স্কুল যেত রবীন্দ্র সরণীর পাশ দিয়ে।

চীৎপুরের ও তল্লাটের বকাটে ছোকরাগুলো করুণাকে দেখলেই শিষ দিত কুৎসিত ইঙ্গিত করত।

করুণা কিন্তু এদের পাত্তাই দিত না। সামনাসামনি এসে কেউ যদি বেয়াদপি করে তবে পায়ের চটি জুতো খুলে মারতেও দ্বিধা করতো না।

এদিকে করুণার স্বাধীনচেতা দাপটে পাড়ার উঠতি বয়সী ছেলে ছোকরাও হারমানতে নারাজ। শেষ পর্য্যন্ত এই ছেলেগুলোর মধ্যে চারজনে মিলে ফন্দী আঁটল। সামনের দোলে করুণাকে ওরা কিডন্যাপ করবে।

যা ভাবা তাই কাজ।

দোলের দিন ওরা করুণাকে রাসবাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গেল বরানগরের পড়ে থাকা এক পোড় বাড়ীতে। সেখানে ওর মুখ বেঁধে চারজন যুবকে মিলে রাত ভোর পাশবিক অত্যাচার চালাল। পরে ভোর রাতে একটা ট্যাক্সি করে ওকে নিয়ে এসে শোভাবাজারের রাজবাড়ীর পিছনের গলিতে ফেলে সবাই উধাও হল।

করুণাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে খাটালের দুধওয়ালা থেকে শুরু

করে পাশাপাশি বাড়ীর সবাই ভীড় করল। বুঝতে পারল ব্যাপারটা। তারপর জ্ঞান নেই দেখে ওদের মধ্যেই কেউ এসে চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে, ও মেয়ে ও মেয়ে বলে ডেকে জ্ঞান ফেরাল। এল পুলিশ।

কারণ ওই ট্যাক্সিওলাই সোজা গিয়ে থানায় খবরটা দেয়। যে চারজন যুবক ভোরে তার গাড়ী ধরে ওকে বরানগরের বাগানবাড়ী থেকে তুলে এনে এখানে ফেলে পালায় ওদের দু'জনের নামটাও শুনেছে। যখন কথা বলছিল তখন ওদের মুখে দেশী মদের গন্ধও বার হচ্ছিল। একজনের নাম রামু আর এক জনের নাম ভজু। ঠিক কোন পাড়ায় থাকে বলতে পারব না। আর এখানেই বা কেন ফেলে পালাল তাও জানি না। ট্যাক্সিওয়ালা পুলিশকে বলে।

যাই হোক পুলিশ তার যথা কর্ত্তব্য করতে উঠে পড়ে লেগে গেল।

নাম জানতে চাইল মেয়েটির। ঠিকানাও।

কিন্তু করুণার মুখ দিয়ে শত জেরাতেও তার নাম আর ঠিকানা বেরল না। চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। সে এখন কোথায়, এরা কারা কেন জিজ্ঞাসা করছে এসব কথা কিছুতেই যেন বুঝতে পারে না। তবে তার দিদি গীতার কথা বার বার মনে পড়ছিল তাই কেবলই বলছিল গঙ্গায় যাব। চান করতে যাব। আমাকে আপনারা ছেড়ে দিন। ওরা আমায় না হলে মেরে ফেলবে।

পুলিশ জিজ্ঞাসা করে কারা তোমায় মেরে ফেলবে। তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়?

করুণা আর কিছু বলে না।

মাঝে মাঝে উদাসভাবে বলে গঙ্গায় যাব চান করব। আমি অপবিত্র হয়ে গেছি। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। মা গঙ্গা আমায় ডাকছে।

পুলিশ বুঝতে পারে সবই। হয়ত বুঝতে পারে সে গঙ্গায় গিয়ে আত্মহত্যা করতে চায়। কিন্তু তা তো আর হতে দিতে পারে না। তাকে প্রথমে মেডিকেল চেক আপ করান হোল।

চলল সেবা শুশ্রুষা মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে রেখে। দিন দশেকের মধ্যে ভালও হয়ে গেল মেয়েটি। তারপর একদিন সন্ধ্যায় ভিজিটিং

আওয়ার্সে সে বেড থেকে পালাল ।

এরপর আর কেউ খুঁজে পায়নি । তবে ওই রাত্রেই হাওড়া ব্রীজ থেকে একটা মেয়ে নাকি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল ।

ঘটনার প্রকাশ গতকাল রাত্রে যে মেয়েটি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল তাকে উদ্ধার করে লিলুয়া উদ্ধারাশ্রমে রাখা হয়েছে । অবশ্য এই মেয়েটি সেই করুণা কিনা কেউ জানে না । হতেও পারে সেই করুণা ।

সদাশিববাবু করুণার সব খবর বড় দেরীতে পান । কাগজের খবর পড়ে তিনি নিজেই লিলুয়া উদ্ধারাশ্রমে মেয়েটির সাথে দেখা করেন । কিন্তু মেয়েটির মুখে না ছিল বাণী না ভাষা শুধু চোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারায় জল ঝরে পড়তে দেখলেন সদাশিববাবু । কত কাতর প্রার্থনা জানালেন কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ওর নাম করুণা ও আমার মেয়ের মত । আপনারা ওকে ছেড়ে দিন আমিই ওকে সুস্থ করে তুলব । তা কেউ কর্ণপাত করেন নি সদাশিববাবুর কথায় । ভেবেছে বুড়োটা পাগল ।

এরপর আর কি ।

সদাশিব রায় তার সাধের পাঠশালা কাম কর্মশালা তুলে দিতে চেয়েছিলেন ।

নিজেও অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে বেশ কিছুদিন ধরে রোগ ভোগ করলেন । লো প্রেসার অ্যানিমিয়া ও বাতে প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছেন । চুলগুলো হঠাৎই যেন সাদা ধবধবে হয়ে গেছে । শরীরে এতটুকু বল নেই যে বিছানা ছেড়ে ওঠেন ।

তবু সীতা আর লাবণ্যর শুশ্রূষাতেই সদাশিববাবু একটু একটু করে ভাল হয়ে উঠলেন । মানসিকভাবেও সুস্থ হয়ে উঠলেন । কারণ তার সাধের পাঠশালার একমাত্র সলতে সীতা এবছর বি, এ, অনার্স নিয়ে পাশ করেছে । তাছাড়া সে ইতিমধ্যে কমপিউটার ট্রেনিং নিয়েও ভাল সার্টিফিকেট পেয়েছে ।

এসব ছাড়াও আরও একটা শুভখবর আছে ।

— আগামী ২রা ফাল্গুন সীতার বিয়ে হচ্ছে । উদার মনোভাবাপন্ন এক সম্ভ্রান্ত বংশের নব্য যুবকের সঙ্গে । ছেলেটি কোলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ

করছে। ইনকাম খুবই ভাল কারণ ইতিমধ্যে সে ভাল নাম যশ করে ফেলেছে।

ছেলেটির নাম রাম কুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৯৮০ সালে সোনাডাঙ্গা গভঃমেন্ট হাইস্কুল থেকে ফাস্ট ডিভিশনে পাশ করে। আর সদাশিব রায় তখনও ওখানকার প্রধান শিক্ষক।

কাজেই সদাশিববাবুর এক প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে, সদাশিববাবুর কাছে মানুষ হওয়া এক কন্যা সীতার।

২রা ফাল্গুন রবিবার সোনাডাঙ্গার রায় পাড়ায় জমে উঠেছে বিরাট উৎসব। হ্যাঁ একটা বিবাহ বাসরকে কেন্দ্র করেই এই উৎসব।

রাত্রে আলোর বন্যায় জৌলুস আরও জম জমাট।

রাত ঠিক আটটায় বিবাহ বাসরের এক বিশেষ মঞ্চে সমবেত নিয়ন্ত্রিত সজ্জন ভদ্রমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত হলেন বর কনের বেশে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সদ্য পদবীপ্রাপ্ত সীতা চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চে আরও হাজির হলেন সীতার মা লাবণ্য এবং এদের মহানত্রাতা সাক্ষরতা কাম স্বনির্ভরতা পাঠশালার সেই মাস্টারমশাই সদাশিব রায়, সোনাডাঙ্গার জমিদার করুণানিধান চট্টোপাধ্যায় ও আরও বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তিবর্গ।

হালকা সুরে সানাই বাজছিল।

একটু পরেই মঞ্চে উপস্থিত হলেন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারার শম্ভুনাথ গড়াই।

বরকনের সই সাবুদ হলো। সাক্ষীদের সই সাবুদ হলো।

মঞ্চেই উলুধ্বনি হোল। শাঁখও বাজল। বাজল ক্যাসেটে বিবাহের মন্ত্রধ্বনি যদ হৃদং হৃদয়ং তব তব হৃদং হৃদয়ং মম। এরপর এলেন পুরোহিত। সবিস্তারে আরও কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে মাল্যদান পর্ব সমাপ্ত করালেন।

সামনের সারিতে বসা কিছু ক্যামেরাম্যান ছবি তুলল। ভিডিও ক্যামেরাতেও ছবি উঠল দীর্ঘক্ষণ ধরে। এরপরই সেই খবর।

খবরই বটে।

মঞ্চে ঘোষণা করা হোল — আজকের এই বিশেষ মঞ্চে উপস্থিত আছেন কোলকাতা সোনাগাছির স্বাক্ষরতা কাম স্বনির্ভরতা পাঠশালাব প্রধান মাস্টার মশাই সদাশিব রায়। আরও উপস্থিত আছেন হাইকোর্টের জাস্টিস

রামানুজ তেওয়ারী ।

আজকের এই সভায় পঃ বঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সদাশিব রায় মশাইকে সম্বর্ধিত করা হচ্ছে তার ওই বিশেষ পাঠশালার বিশেষ প্রচেষ্টার জন্য । পঃ বঙ্গ সরকার সব খবরই রাখতেন তবে সময়মত এতদিন কিছু করে ওঠা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি । এজন্য সরকার দুঃখিত। তবে সরকার চান এরূপ প্রচেষ্টা চালু থাকুক সেই সঙ্গে সদাশিব রায়ের পাঠশালাটিও । পঃ বঙ্গ সরকার এখন থেকে প্রতি মাসে এই পাঠশালাটিকে এক হাজার টাকা করে অনুদান দিয়ে যাবে । পঃ বঙ্গ সরকার সদাশিববাবুর এই কর্মকাণ্ডের সফলতার জন্য তাঁকে একটি মানপত্র ও একটি রৌপ্যপদক দিয়ে বিশেষভাবে সম্মানিত করছেন ।

এরপরই জাস্টিস রামানুজ তেওয়ারী সদাশিববাবুকে মাল্যদান করে তার হাতে রৌপ্যপদকটি ও মানপত্রটি তুলে দিলেন ।

হাততালি দিয়ে সমবেত দর্শকমণ্ডলী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করল । অতঃপর জাস্টিস তেওয়ারী বললেন সদাশিব রায় মশাই এতদিন ধরে যে এরূপ একটি কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন তা সত্যিই প্রশংসার উর্দ্ধে। তিনি যে অনগ্রসর নির্যাতিত পিতৃপরিচয়হীন নাবালিকা ও সাবালিকাদের আর অবহেলিত হতে দেবেন না এবং তাদের স্বনির্ভর করে তুলবেন বলে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন তারই জন্য সরকার খুশী হয়ে তাকে এই বিশেষ সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। সদাশিববাবুর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে তবুও আমরা আশা রাখব যতদিন উনি বেঁচে থাকবেন এই মহান কর্মকাণ্ড যেমন চালাচ্ছিলেন তেমনই চালিয়ে যাবেন।

মঞ্চে বসা সদাশিব রায় মশাইয়ের চোখ দিয়ে দর বিগলিত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল । তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সীতা আর রামকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন তোমরা দীর্ঘজীবী হও, সুখী হও ।

সদাশিববাবু আরও বললেন আজ মনে পড়ে আমার চার কন্যার কথা। গীতার কথা, করুণার কথা লাবণ্যর কথা । এদের কাউকেই আমি সুখী করতে পারিনি । ব্যতিক্রম শুধু সীতা । আমার সীতা মায়ের জয় হয়েছে এতেই আমি আনন্দিত, খুশী । কি বলব সীতা মায়ের এ সাফল্যের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকুক ইতিহাসের পাতায় ।

জয় কাঠিয়া বাবার জয়

নাম শুনেছেন তো কাঠিয়া বাবার।

মস্ত বড় গুণিন সাধু।

লছমন ঝুলা পেরিয়ে হরিদ্বারে গীতা ভবনে যাবার পথে বাঁদিককার ওই জঙ্গলের মধ্যে দিনরাত ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতেন এক সাধুবাবা।

এক চিলতে কৌপিন, একটা লোটা, একটা কম্বল আর একটা লোহার বড় চিমটে এই ছিল কাঠিয়া বাবার সম্পত্তি।

কাঠিয়া বাবা কিন্তু এক অদ্ভুদ ঐশ্বরিকশক্তির অধিকারী ছিলেন। যার ওপর দয়া হোত তাকে হাত উপুড় করে দিতেন তিনটি বীজ আর তিনটি কাঠি।

নবদ্বীপ ধামের দোলমঞ্চের ওপাশে পুরোন চণ্ডীমণ্ডপে বসে সেদিন রাধাগোবিন্দ ঢোল আরও বলল -- আমার বাবার বাবা মানে ঠাকুরদা ছিলেন একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। তার মাথা গোঁজা ঘরটুকু ছাড়া না ছিল চাষবাস করার জমি না টাকা পয়সা। ঠাকুরমা অতি কষ্টে দিন চালাতেন। বাবাকে কোন মতে খাইয়ে দাইয়ে বড় করেছেন। লেখাপড়া শিখিয়েছেন। এদিকে কি করে চলছে সেসব বিষয়ে ঠাকুরদার কোন দায় দায়িত্ব ছিল না। তারপর ঠাকুরমার কাছ থেকে ক্রমাগত ধাতানি খেতে খেতে ঠাকুরদা শেষমেশ একদিন বিবাগী হলেন।

রাধাগোবিন্দ ঢোল বলতে লাগল আমার তখন আর কত বয়স ১০/১২ বছর হবে। তারপর বাবা ইউনিয়ন বোর্ডের একটা চাকরী পেল। আমরা বেঁচে গেলাম। তারপর ক্রমশ ঠাকুরদাকে আমরা ভুলেই বসলাম।

আমার যখন ২০/২২ বছর বয়স তখন বাড়ীতে একদিন এক জটা জুটোধারী দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী এসে হাজির। সাধুবাবা বলল বেটা কেয়া নাম তুম্হারা -- রাধাগোবিন্দ্ হ্যায় কি না।

বললাম হ্যাঁ।

সাধুবাবা বলল তেরা বাবা কাঁহা হ্যায়। ঠাকুরমা কিধার হ্যায়।

বললাম ঠাকুরমা দশ সাল হোল মারা গেছেন । আর বাবাও বছর তিনেক হোল দেহ রেখেছেন । মা আছেন -- ডাকব ?

সাধুবাবা বলল আমাকে তুমি চিনবে না । আমি তোমার বাবার বাবা আছি । হরগোবিন্দ্ ঢোল । ৯০ সাল উমর হোল হামার ।

হরগোবিন্দ ঢোল বলতে লাগল -- তোমার বাবা মা ঠাকুরমাদেরকে খেতে দিতে না পেরে আমি দেশত্যাগ করে চলে গেছিলাম হরিদ্বার ।

হরিদ্বারে কাঠিয়া বাবার আশ্রমে ছিলাম এতদিন ।

দিনরাত ওখানে বাবা ভোলেনাথের ভজন কীর্ত্তন আর জপ তপ করে ভালই ছিলাম সব ভুলে । কাঠিয়া বাবাকে ঘিরে বসে থাকত কত ভক্ত । ভক্তরাই বাবার আর বাবার চেলাদের সেবা শুশ্রূষা ভোজন করাত । বাবা সন্তুষ্ট হয়ে দীক্ষা দিতেন । দিতেন তিনটি কাঠি আর তিনটি বীজ । বলে দিতেন ওগুলো দিয়ে কি করতে হবে । ভক্তরা খুশী হয়ে যে যার বাড়ী চলে যেত।

তা একদিন কাঠিয়া বাবা আমাকে বলে বসল হ্যাঁরে হরগোবিন্দ্ তুই তো এখানে বহুৎ সাল আছিস । আরে আমার তো মনেই ছিল না তোর কথা । যা যা এবার দেশে ফিরে যা । পারিস তো ওখানেই একটা আশ্রম খুলবি নিজে। আর এই নে তিন কাঠি আর তিন বীজ । যা বলে দিচ্ছি সেই মত ক্রিয়া করবি । বীজে আর কাঠিতে রোজ জল দিবি । বড় হলে ফল পাবি ফুল পাবি । আমার বিশ্বাস এতেই তোদের সংসার বহুত আচ্ছা সে চলে যাবে । লেকিন কিছু দিনকে লিয়ে অপেক্ষা করনে পড়েগা । গাছকো বড়া হোনে কা টাইম দেনা পড়েগা । চলা যা আজই আভি। দেখ বউ বেটারা কেউ তোকে পয়ছানতে পারে কিনা ।

এরপর রাধাগোবিন্দ আবার বলতে লাগল -- আমি যেন মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে ঠাকুরদার কথা শুনছিলাম । তারপর জ্ঞান ফিরে আসতে প্রণাম করে ওনাকে ওদিককার ঠাকুরমার ঘরে এনে বসতে দিলাম । মা এসে পাখার বাতাস করতে লাগল । আমি জল বাতাসা এনে ঠাকুরদাকে খেতে দিলাম । সে এক দৃশ্য ।

এরপরই সেই সাধু বাবা অর্থাৎ কিনা আমার ঠাকুরদা তার ঝোলা

থেকে তিনটি বীজ আর তিনটি কাঠি মত কি বার করে বললেন চলত দেখি ওই পুকুরপাড়ে যাই । একঠো খুরপি কি শাবল আনবি -- গাছ লাগাব পুকুরপাড়ে।

তারপর আমরা দু'জনে গেলাম বাঁশবাগানের ওধারে পুকুরপাড়ে। সাধুবাবা মানে আমার ঠাকুরদা নিজে হাতে করে বেশ কিছুটা দূরে দূরে তিনটি বীজ পুঁতলেন তারপর আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তিনটি কাঠির মত কিসের ডাল বসালেন ।

বর্ষার সন্ধ্যায় সাধুবাবা গাছগুলো পুঁতে দিয়ে বলল রোজ জল দিবি দু'বার করে আর গাছ বড় হলে ফল পাবি, ফুল পাবি । এফুল খাওয়া ভি যায় । এতেই তোদের সংসার একদিন ভাল করে চলে যাবে । চিন্তা মত্ কর ।

এরপর সাধুবাবা পুকুরে নেমে হাত পা ধুচ্ছিলেন । হঠাৎ উঃ বলে একটা শব্দ করলেন ।

আমি ছুটে নীচে নেমে দেখি সাধু বাবা অজ্ঞান হয়ে জলে পড়ে গেছেন। আর দেখলাম একটা গোখরো সাপ সর সর করে পাড়ের ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে ।

সাধু বাবা আর কথা বলেনি ।

এরপর আপনারা তো সবাই জানেন । পাড়াপড়শিকেডেকে সাধু বাবা তথা আমার ঠাকুরদার যথা বিহিত সৎকারাদি করালাম । শ্রাদ্ধশান্তিও সারলাম ।

এরপর সব ভুলেও গেছিলাম । ঠাকুরদার কথাও । কিন্তু ক'বছর বাদে একদিন পুকুরপাড়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখি এদিকে তিনটে কাঁঠালগাছ গজিয়ে উঠেছে আর ওদিকে তিনটে বকফুলের গাছ । বকফুল গাছে সাদা ফুলও এসেছে । আর কাঁঠালগাছের গোড়াতে ঝুলছে কচি-কচি এঁচোড়।

রাধাগোবিন্দ বলতে লাগল আজ আপনারা আমার বড় পুকুরপাড়ে যে কাঁঠালবাগানটা দেখতে পান সেটা আমার ঠাকুরদারই দান । আর ওপাশে বকফুল গাছের বাগানটাও । অবশ্য এই বাগানের মধ্যে মধ্যে আমি সজনে গাছও লাগিয়েছি । বলতে নেই পরিশ্রমের ফল আমি পেতে শুরু করেছি

বেশ ক'বছর আগে থেকেই। বাগানে প্রচুর কাঁঠাল, সজনে আর বকফুল হয়। পাইকারী দরে বিক্রী করেও আমাদের ভালই ইনকাম হয়। আর তারই দৌলতে আজ বিয়ে করেছি, ওই আটচালা ঘরটা বানিয়েছি, টিভি এনেছি। তারপর ঠাকুরদার আশীর্বাদে আপনাদের এক নাতিও হয়েছে। তা আমরা সব মিলিয়ে ভালই আছি।

চণ্ডীমণ্ডপে এতক্ষণ যারা রাধাগোবিন্দ ঢোলের গল্প শুনছিলেন তাঁরা একত্রে বললেন তোমার ঠাকুরদা আবার ফিরে এসেছে হে ওকে একটু যত্ন করো।

আরও একজন বললেন সবই সাধুবাবার কৃপা। কাঠিয়া বাবার অপার করুণা না থাকলে কি এসব হয়। হয় না।

জয় কাঠিয়া বাবার জয়।

স্বপ্নে দেখা মা কালী

(নকসি কথা)

রোজই রাতে মাকালীকে স্বপ্নে দেখি । শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীর সাথে পঞ্চবটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ।

মা কখনও ছেলেকে ডেকে আদর করছেন, কখনও বকাবকি করছেন । কখনও বা মা-ছেলেতে বাগানময় ছুটোছুটি করে খেলা করে বেড়াচ্ছেন । আবার কখনও মা এলোচুলে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন আর রামকৃষ্ণ মাকে জবাফুল দিয়ে পূজো করছেন ।

আমি সব সময় হৃদের মত বাবার কাছাকাছি থাকতাম । মা ছেলেতে কি কথা হয় সব শুনতাম ।

একদিন শুনি মা রামকৃষ্ণকে বলছেন জানিস বুড়োটার জন্য বড় কষ্ট হয় । দিন-রাত গাঁজা ভাঙ খেয়ে এখানে ওখানে শ্মশানে পড়ে থাকে। তা একদিন ভীষণ নেশা করে ঘরে ফিরে বলে কি -- ওগো আমার গাটা একটু মাড়িয়ে দাও দেখি । বড় ব্যথা করছে সারা শরীরটায় ।

তা তখন তো আর কৈলাসে ম্যাসাজ ক্লিনিক ছিল না । ঠাকুরের গা হাত পা কামড়াতেই পারে । একটু টিপিয়ে নেবার তাই দরকারও পড়ে।

শিব বললেন -- কই গো এই নাও আমি চিৎ হয়ে শুচ্ছি । তুমি পুরো শরীরটা বেশ করে একটু মাড়িয়ে দাও । কেউ নেই এখানে, নন্দী ভৃঙ্গিও ঘুমোচ্ছে কেউ দেখবে না ।

মাকালী আর কি করেন । ওই খালি বসনেই মা দাঁড়িয়ে পড়লেন শিবের শরীরে । আর হাত পা মাড়াতে মাড়াতে পরে বুকের ওপর উঠে পড়লেন ।

শিব স্বস্তিতে বললেন -- আঃ বাঁচলাম ।

ঠিক এই সময় গণেশের সাদা ইদুঁরটা ছুটে চলে গেল শিবের পাশ দিয়ে। হয়ত বা ইঙ্গিত দিয়ে গেল সতীনের ছেলে গণেশ আসছে এদিকে।

বলতে না বলতেই গণেশ এসে হাজির । গণেশের হাতে পৃথিবী থেকে

উপহার পাওয়া একটা ভাল ক্যামেরা ।

মাকালীকে চমকে দেবে বলেই ক্যামেরাটা অন করা ছিল ।

সুইচটা টিপতেই ক্লিক করে শব্দ হোল -- আলো ঝলসে উঠল অন্ধকার গুহায় ।

তারপর ছবিটা পৃথিবী থেকে ডেভালাপ প্রিন্ট করিয়ে এনে দেখা গেল -- মাকালীর জিভ কাটা ভঙ্গীর সেই ছবিটা। যেটা আজও আমরা দেখতে পাই যে কোন কালীমন্দিরে আর ক্যালেণ্ডারে ।

মাকালী ছবিটা দেখে গণেশকে বললেন এ তুই কি করলি বলত গণশা। আমার এই জিভ বের করা ছবিটা তুই তুললি । ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা। লোকেদেখলে কি বলবে বলত। দুষ্টু ছেলে কোথাকার । দাঁড়া দুগ্গাকে বলে দেব, এবার থেকে তোকে যেন একটু কড়া শাসন করে ।

মাকালী দুগ্গাকে এসব কথা তো বলে দিয়েছিলেনই উপরন্তু আরও একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন -- দুগ্গা যেন এবার পৃথিবীতেগিয়ে কলাবতীর সাথে গণশার বিয়েটা তাড়াতাড়িসেরে ফেলে ।

মন চন্দন
(অনু গল্প)

অতি সুন্দর মুখশ্রী মেয়েটার। তন্বী ষোড়শী।

নাম অনসূয়া।

গঙ্গার ধারে মিলেনিয়াম পার্কে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওরা বসেছিল দু'জনে, পাশাপাশি। রাহুল অনসূয়ার বয় ফ্রেণ্ড।

অনসূয়া বাগানের ছোট্ট একটা গাছ থেকে একটি কিশলয় ছিঁড়ে নিয়ে ডান হাতের দু'টি আঙুলে করে কেবলই ঘোরাচ্ছিল। আর শুনছিল রাহুলের ফিস্ ফিসানি।

অনসূয়া কিশলয়ের বোঁটাটি ধরে একবার নিজের এগালে, একবার ওগালে, একবার কপালে, একবার ঠোঁটে বোলাচ্ছিল।

রাহুল অনসূয়ার হাত থেকে বোঁটাশুদ্ধ কচি পাতা দু'টিকে কেড়ে নিয়ে কিসে যেন ভিজিয়ে ফেরৎ দিল।

অনসূয়া বলল -- চন্দনের গন্ধ এল কোথা থেকে ?

রাহুল প্রশ্ন করল -- কি আর কত দিন অপেক্ষা করব। উত্তরটা দাও। সত্যি করে বলত, তুমি আমাকে বাস্তবিকই ভালবাস কি না ?

অনসূয়া কিছুই বলল না।

মৃদু হাসতে লাগল আর কিশলয়ের সেই পাতা দু'টিকে আঙুলে করে ঘোরাতে ঘোরাতে আবার ওর নিজের গালে, মুখে, কপালে ঠোঁটে ছোঁয়াতে লাগল।

ওপারে বোটানিক্যাল গার্ডেনের কিনারে রাখা জাহাজটা থেকে ভোঁ বাজল। পর পর দু'বার।

রাহুল বলল এই 'সূ' তোমার পার্স থেকে আয়নাটা একবার দাও তো।

অনসূয়া প্রশ্ন করল - কেন ?

-- আহা দাও-ই না।

অনসূয়া আয়নাটা পার্স থেকে বের করে রাহুলের হাতে দিল।

রাহুল আয়নাটা তৎক্ষণাৎ অনসূয়াকে ফেরৎ দিয়ে বলল -- তোমার মুখটা একবার দেখ ।

অনসূয়া আয়নাটায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল । এ কি ! তার মুখে, গালে, কপালে, ঠোঁটে এত ওষ্ঠাধরের ছাপ এল কি করে ?

লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল অনসূয়া ।

রাহুল প্রশ্ন করল -- কি হোল তোমার ? অমন রাঙা হয়ে গেল কেন তোমার মুখটা ?

অনসূয়া কিছুই না বলে পার্স থেকে হ্যাণ্ডকারচিফ্‌টা বের করে তার গালে মুখে কপালে আঁকা চুম্বন সদৃশ সেই দাগগুলো মুছতে লাগল ।

রাহুলের খুব আনন্দ হোল । তার মন-চন্দনে মাখান কিশলয়ের কি অপূর্ব ক্ষমতা । বাস্তবিকই সে যদি তার ঠোঁট দিয়ে অনসূয়ার কপালে, গালে, ঠোঁটে অতগুলো ছবি এঁকে দিতে পারত এই পার্কে, কে বারণ করত তাকে।

অনসূয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল -- দুষ্টু কোথাকার ।